অক্টো-নভেঃ 1988

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

ক্লাস অ্যানুয়াল

ও

প্রতিযোগিতামূলক
পরীক্ষায়
সাফল্যের জন্য

গ্রন্থসূচী : সায়েন্স ক্যুইজ ● গণিত ক্যুইজ ● নলেজ ক্যুইজ ফিজিক্স ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ● লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

লেখকসূচী : অমরনাথ রায় ● অরূপরতন ভট্টাচার্য ● অলক চক্রবর্তী ● তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে
৬টি বইয়ের
সেট ৫০.

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ
সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা

অক্টো-নভেঃ ঃ 1988
যুগ্ম-সংখ্যা

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ আবার মঙ্গলে ॥ সমরজিৎ কর 9

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ চায়ের গল্পগাছা ॥ সুজিৎ মুখোপাধ্যায় 19 ঃ ভারতে প্রথম চা শিল্পের সূচনা ॥ রতন বড়ুয়া 21 ঃ স্টম্যাক ক্যানসারে সবুজ চা ॥ যদুপতি মল্লিক 22

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ আবর্জনা ॥ মধুমিতা সাহা 47 ঃ মঙ্গলগ্রহের মলিকিউলিক্সার ॥ উজ্জ্বল আচার্য 45

পড়াশোনা ঃ ভগ্নাংশের ল. সা. গু ও গ. সা. গু. ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 15 বৃত্ত, একটি নতুন ধর্ম ॥ দেবাশীষ গোস্বামী 17 ঃ উষ্ণতা ও তার পরিমাপ ॥ সমীরকুমার ঘোষ 27

কমপিউটারের কলা-কৌশল ঃ হার্ড ডিস্ক ॥ সৌম্য মিত্র 29

ইলেকট্রনিক্স ঃ ইলেকট্রনিক্সের উপকরণ ॥ সৌমেন মজুমদার 61 ঃ ইলেকট্রনিকস ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 41

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা ঃ পশুদের রাজা ॥ প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায় 16 জ্ঞান বিজ্ঞানের বই 49 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 74

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ বিজ্ঞানীর টুকিটাকি ॥ অমরনাথ রায় 54 ঃ বাঙালীর বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস ॥ শংকর ঘোষ 55 ঃ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ॥ জয়ন্ত মণ্ডল 57

ছড়া ঃ পরিবেশ দূষণ ॥ কমল চক্রবর্তী 28

ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 11 ঃ বাজপাখিদের কথা ॥ অজয় হোম 12 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট 63 ঃ সমাধান 66 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 64 যুগের ভিতর যুগ ॥ গৌতম কর্মকার 51

ধারাবাহিক রচনা ঃ নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 31 ঃ উড়নচাকি রহস্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন 35

কার্টুন ঃ রেবতীভূষণ 20 ঃ শৈল চক্রবর্তী 42

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ উত্তরদাতাদের নাম 71 ঃ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে বিদ্যুৎ ॥ সিদ্ধার্থশংকর জানা 67 ঃ শব্দকূট প্রতিযোগিতা 88 ঃ বিজ্ঞানী আউট ঃ সংশোধনী 69 ঃ আশ্চর্য ইন্টারকম ॥ বাণীপ্রসাদ দাস, সুমন মুখার্জী 62

আগামী সংখ্যায়

'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'
এর শতবর্ষ
লিখবেন
কিন্নর রায়

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ॥ অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

চিঠিপত্র

সৌর ঝড় না সৌর বাতাস

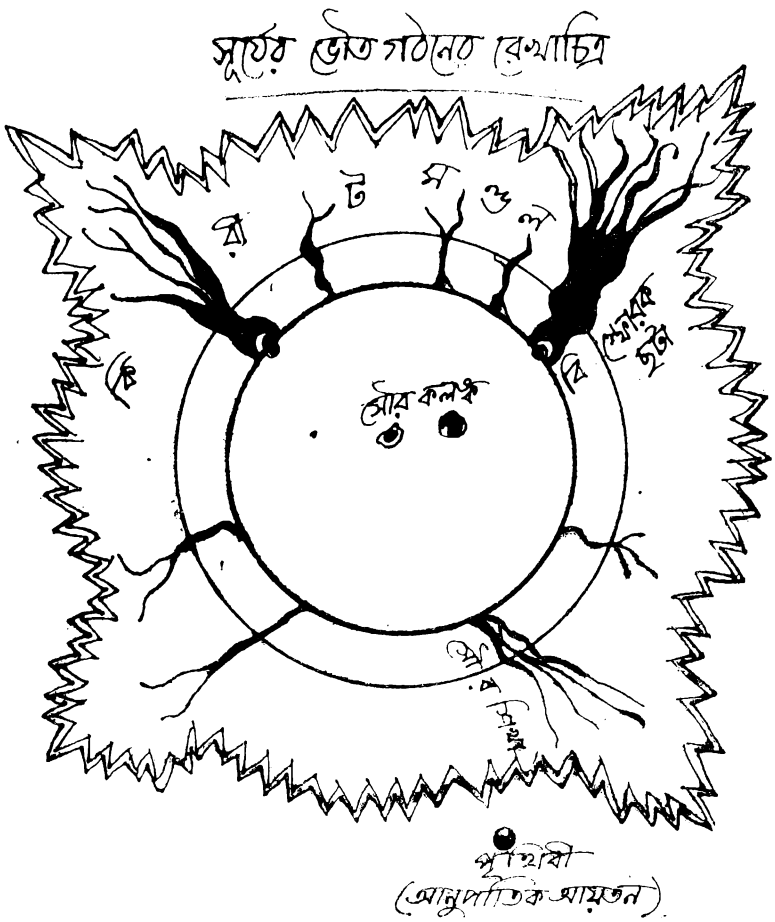

সূর্যের ভৌত গঠনের রেখাচিত্র

কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান—মে—1988-তে প্রকাশিত "সৌরঝড়" লেখাটি আমার কিছুটা অস্পষ্ট মনে হয়েছে। লেখাটির নাম "সৌর বাতাস" বা সোলার উইণ্ড হলেই ঠিক হত।

আমরা জানি সূর্য একটি অতি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড, অতিবেগে ঘূর্ণায়মান এবং গতিশীল সুবৃহৎ একটি অগ্নিগোলক। তবে তার সাধারণ ভৌত গঠন সম্পর্কে অধিকাংশেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই সে বিষয়ে লোকরঞ্জন বিজ্ঞান বা পপুলার সায়েন্স হিসাবে কিছু তথ্য না দিলে ঐ সৌরঝড় বা সৌরবাতাস সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। সাধারণভাবে সূর্যের যে-রূপ বা অংশটিকে আমরা দেখি সেটি হচ্ছে ঐ বিরাট গোলকের উপরিভাগ বা পৃষ্ঠদেশ। সেখানে গ্যাসপুঞ্জ শুধু জ্বলন্ত উত্তপ্তই নয় তা এমন ঘনীভূত যে তার ভিতরের দিকে আর কিছু দেখা যায় না। সূর্যের এই পৃষ্ঠতলকে বলে "আলোকমণ্ডল"।

আত্মা, জন্মান্তর, পরলোক

জুলাই মাসের 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে 'আত্মা, জন্মান্তর, পরলোক' শীর্ষক বিজ্ঞান ভিত্তিক পত্রটি পড়লাম। পত্র লেখক তাঁর চিঠিতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে প্রমাণ, প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে আত্মা, জন্মান্তর ও পরলোক বলে কিছু নেই। ওসব আমাদের সমাজে ও দেশে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। এ সবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই।

পত্র লেখকের মতে যা গবেষণাগারে প্রমাণ করা যায় না, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাকে বিজ্ঞান সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রমাণিত সত্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মানবিক, লৌকিক জিনিষ। তার বাইরে আর যে সব বস্তু আমরা কল্পনা করি বা অনুভব করি তা অলৌকিক, অসম্ভব। আপাত দৃষ্টিতে পত্র লেখকের বক্তব্য অযৌক্তিক নয় এবং তা অস্বীকারও করা যায় না।

কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মানুষের কল্পনা, চিন্তা ভাবনা কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবকে অতিক্রম করে গেলেও তাকে কি আমরা অসম্ভব, অলৌকিক বলতে পারি? তাহলে ইউরোপের প্রথম কল্পবিজ্ঞান লেখক মহাকাশ নিয়ে কয়েকশত বছর আগে যে সব কাহিনী লিখে গেছেন পুস্তকাকারে তা এখন মহাকাশ গবেষণার কি করে বাস্তব সত্যে পরিণত হচ্ছে? চাঁদে যে মানুষ কোনদিন মহাকাশযানে চেপে পৌঁছতে পারবে এবং গ্রহান্তরে রকেটে চেপে ছুটে যাবে সব অত্যাধুনিক মহাকাশযানে তা কি আমরা কয়েকশ' বছর আগে ভাবতে পেরেছিলাম। তখন কল্পবিজ্ঞানের সে সব কাহিনী পড়ে মানুষ কৌতুক

তার উপর বিরাট বিস্তৃত হাল্কা পাতলা গ্যাসের আবরণ অবশ্যই আছে—যাকে বলা যাবে সূর্যের আবহমণ্ডল। সেই অংশ এতই পাতলা যে সাধারণভাবে তা দেখা যায় না এবং তার ভিতর দিয়ে সূর্য-পৃষ্ঠ বা ঐ আলোকমণ্ডল সহজেই দেখা যায়। ঐ আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা প্রায় 6 হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। তারপর ভিতরের দিকে ঐ জ্বলন্ত গ্যাসের উষ্ণতা ও ঘনত্ব ক্রমেই বেশি। কারণ সূর্যের অতিকায় আয়তন ও তার বিশাল ভরের চাপ। আয়তনে সূর্য পৃথিবীর 13 (তের) লক্ষগুণ এবং ভর বা ভারে—পৃথীবীর 3,33,420 গুণ। তাই তার অভিকর্ষ শক্তিও প্রবল,—পৃথিবীর 28 গুণ। এই অবস্থায় তার কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রী (সে.)। সেখানে চাপের মাত্রা প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে 60 লক্ষ টন। এই প্রবল তাপে সূর্যের কোনখানেই কোন বস্তু কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। সবই গ্যাসে পরিণত। তবে সেই গ্যাস সাধারণ গ্যাস নয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থ গ্যাসের ঘনত্ব জল অপেক্ষা 90 (নব্বই) গুণ বেশি। কারণ—ঐ প্রবল চাপ। আর অত্যুগ্রতাপে সূর্যের সমস্ত অংশের পরমাণু সমূহের প্রোটন-ইলেকট্রন পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে প্রত্যেকেই "আয়নিত" বা তড়িৎ-আধানযুক্ত কণায় পরিণত। পদার্থের এই অবস্থাকে বলে "প্লাজমা"—বা "চতুর্থ অবস্থা"। প্রচণ্ড তাপে প্রবল গতি সম্পন্ন হয়ে সেই আয়নিত কণাগুলি অবিরতই সূর্যের ভিতর থেকে বাইরে ছুটে চলেছে ; তার পৃষ্ঠতল বা আলোকমণ্ডল ছাড়িয়ে তারা সজোরে ছুটছে অবিরাম ধারায়, ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র সৌরজগতে, বয়ে চলেছে গ্রহাদির চারপাশ দিয়ে—একেবারে আন্তর্নক্ষত্র রাজ্য পর্যন্ত। এরই নাম "সোলার উইণ্ড" বা "সৌরবাতাস"। সাধারণ বাতাস থেকে এর পার্থক্য এই যে এর মূল উপাদান হচ্ছে "আয়নিত কণা", বিচ্ছিন্ন প্রোটন—ইলেকট্রন —তাই একে সৌরকণা প্রবাহ বললে ভাল হয়। তবে একে 'ঝড়' বলা যাবে না। ঝড়ে বাতাসের গতি হয় প্রবল ও বিক্ষুব্ধ। সৌর প্রবাহেও তাই নয়। তার-পিছনে কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণ ও পরিস্থিতি রয়েছে। সেগুলি সহজ-ভাবে গুছিয়ে না বললে সৌরঝড়ের কিছুই বলা হয় না।

সৌরঝড়ের মূলে আছে সূর্যের ভৌত গঠন প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বিশেষ ভৌত-ধর্মের প্রক্রিয়া যাকে বলে "সোলার এ্যাক্‌টিভিটি"। আগেই বলেছি—সূর্য হচ্ছে অতি উত্তপ্ত ঘনীভূত গ্যাস বা পুঞ্জীভূত প্লাজমার একটি অতিকায় গোলক। তার কেন্দ্রে চাপ এতই প্রবল যে সেখানকার বস্তুপুঞ্জ ভারী ধাতুর সমতুল্য। সেই কেন্দ্র থেকে বেশ বড় একটি স্তর ছেড়ে উপরে এলে অতিঘন তরলের মত অবস্থা পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে তাপমাত্রাও কমতে থাকে। গড়ে প্রতি কিলোমিটারে প্রায় 20 ডিগ্রী কেলভিন (সে.) হ্রাস পায়। ফলে পৃষ্ঠতলের নিচে বেশ গভীর পর্যন্ত বিরাট স্তরে প্রায়-তরল প্লাজমার মধ্যে চলে প্রবল তাপজনিত পরিচলন স্রোত বা কনভেক্‌শন কারেণ্ট, অর্থাৎ নিচের বেশি গরম প্লাজমা উপরে উঠে, আর উপরে এসে তাদের তাপ কমে গেলে তারা আবার নিচে নেমে চলে। কোন পাত্রে ফুটন্ত জলের মতই। এই ভাবে সূর্যের-ভিতরের বড় অংশের প্লাজমা স্তর প্রবল বেগে উপরে ওঠা-নামা করে।

আবার সূর্য তার বিশালকায় প্লাজমাদেহ নিয়ে নিজ অক্ষের চারদিকে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে। সেই ঘূর্ণনের বেগ সৌর-গোলকের সর্বত্র সমান নয়। বোধ করেছে, মনে মনে হেঁসেছে। ভেবেছে যে এটা কি করে সম্ভব ?

আজ কিন্তু কেউ সেসব কাহিনী পড়ে হাসে না, কৌতুক বোধ করে না, বরং লেখকের দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে পূর্বে থেকে অনুমান করার অনন্য ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জানায়। ঠিক তেমনি আজ আত্মা, জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবাস্তব, অলৌকিক বলে অবজ্ঞা জ্ঞাপন করা হোক না কোন একদিন না একদিন তা প্রমাণিত হবেই। এবং সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে তা এই মানুষই আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। আসলে আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতি নিয়ে স্বদেশে কি বিদেশে তেমন ব্যাপকভাবে চর্চা আজো শুরু হয়নি। কারণ পরলোক সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সবার মনে একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বোধ ও ভ্রান্ত ধারণা জন্মে গেছে। তাই এ সম্বন্ধে কিছু একনিষ্ঠ কর্মী ও গবেষক ছাড়া আর কেউ তেমন নজর দেন না বা ভাবনা চিন্তার সঙ্গে বাস্তবে কাজ করারও প্রয়োজন মনে করেন না। তাই এখনো পরলোকতত্ত্ব রহস্য ও আঁধারেই থেকে গেছে। তবে আশা করা যায় যে আত্মা, জন্মান্তর সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আত্মা রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হতে আরো অনেক দুরূহ স্তর অতিক্রম করতে হবে ঠিক কিন্তু তা সাফল্যের সিংহদুয়ারে পৌঁছবেই। আজ না হয় কাল। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, থাকতে পারে না।

বিশু মিত্র, আমলাদহি, বর্ধমান

তার বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলেই এই বেগ সর্বাধিক এবং উভয় মেরুর দিকে তা ক্রমশ কম। ফলে সূর্যের বিষুবরেখার সন্নিহিত অঞ্চলে প্লাজমার মধ্যে যে ঘূর্ণন জনিত গতি ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়—তার দূরবর্তী অংশে ঠিক তা হয় না। প্লাজমার এই গতি ও আলোড়নের জন্যও সূর্যপৃষ্ঠে আর এক ধরনের তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উদ্ভব হয় এবং তার প্রাবল্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অক্ষাংশে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। ফলে সূর্যের অভ্যন্তরস্থ প্লাজমার মধ্যে বিভিন্ন রকম স্রোত ও আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার জন্য সূর্যের উপরিভাগে কোন নির্দিষ্ট একটানা স্থায়ী চৌম্বকক্ষেত্র দেখা যায় না, যেমনটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে আছে (ভ্যান এ্যালেন বেল্ট)। পরিবর্তে সূর্যপৃষ্ঠে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তির চৌম্বকক্ষেত্র নানাভাবে দেখা যায় এবং সেগুলির স্থায়িত্ব ও ক্রিয়াপদ্ধতি ঘনঘন বদলায়। তাতে সূর্যপৃষ্ঠে চৌম্বকঝড় সৃষ্টি হয়।

এখন প্লাজমাপ্রবাহের উপর প্রবল চৌম্বক চাপের সৃষ্টি হলে সেই স্থান দিয়ে আর প্লাজমা কণা বাইরে বেরোতে পারে না। সূর্যপৃষ্ঠে তাই যেখানে চৌম্বক চাপ প্রবল হয়ে উঠে সেখান থেকে আর প্লাজমাকণা বাইরে বেরোয় না। একই সঙ্গে ঐ চৌম্বকচাপে সেই অংশের নিম্নস্থ প্লাজমাস্রোত—যা কনভেক্শন কারেণ্ট হয়ে উপরে উঠছিল—তা সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ ভিতর থেকে অতি উষ্ণ প্লাজমাস্রোত আর উপরে আসে না। অথচ উপরের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের তাপ অবাধে বিকিরত হয়ে বইরে চলে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানটি বেশ শীতল হয়ে পড়ে। পাশের স্বাভাবিক আলোকমণ্ডল অপেক্ষা তার উষ্ণতা কয়েক হাজার ডিগ্রী নিচে নেমে যায়। তাতে স্থানটি বেশ অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে।

এই সানস্পট তৈরিতে সেখানে চৌম্বকচাপ বৃদ্ধি হওয়া মানে—তার ঠিক পাশের অঞ্চলে চুম্বকমাত্রা হ্রাস পাওয়া, অথবা ঐ স্থানের চুম্বকমেরুর সংযোগ দূরবর্তী কোন স্থানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যেমন করেই হোক উভয় স্থানের মাঝখানে চুম্বক সংযোগ ছিন্ন হওয়া। সেই চুম্বকচাপশূন্য স্থান দিয়ে তখন আলোকমণ্ডল থেকে প্লাজমাস্রোত তীব্রবেগে ফোয়ারার মত উপরে উঠে। তার নাম "সোলার ফ্যাকুলী" বা "সৌরশিখা"। এদের দু একটি শিখা আবার অত্যুজ্জ্বল বিস্ফোরক আকার ধারণ করে। তাদের বলে "সানফ্লেয়ার" বা "বিস্ফোরক ছটা"। এই আগ্নেয় শিখাগুলি আলোকমণ্ডলের উপরে পাতলা "বর্ণমণ্ডল" ছাড়িয়ে—সর্পিল গতিতে—হাজার হাজার মাইল—এমনকি লক্ষাধিক মাইল পর্যন্ত সবেগে বিস্তৃত হয়। তাতে পূর্বোক্ত "সোলার উইণ্ডে" জাগে আলোড়ন, প্রবল বিক্ষোভ ও গতিপ্রাবল্য এবং সেই সঙ্গে সেখানে হয় প্লাজমাকণার প্রাচুর্য। এই অবস্থার নামই "সৌরঝড়" সাধারণ "সোলার উইণ্ড"—তাই সৌরঝড় নয়। এই "সৌর-ঝড়ের প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যুৎ-চৌম্বক্ষেত্রে ঘটে বিপর্যয়। এমনকি সেই ঝড় অতিপ্রবল হলে পৃথিবীর সমগ্র বিদ্যুৎ প্রবাহও চৌম্বকক্ষেত্র স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে সূর্য থেকে নির্গত ঐ কণাগুলি "তেজস্ক্রিয়" কণা নয়, ওগুলি আয়নিত বা আহিত কণা। আর পৃথিবীর "আয়ন মণ্ডল" এবং "ওজোনস্তর" তৈরি হয়েছে—মূলত অতিবেগুনী রশ্মি প্রভাবে, ঐ সৌর-ঝড়ের দরুণ নয়।

গুণধর বর্মণ
64 এ, গৌরীবাড়ি লেন।

অ্যাপেনডিক্স অপারেশন

জুলাই '88 এর সংখ্যায় কিছু ভুল ও কিছু আশ্চর্য লেখা পেলাম। (1) জানা অজানা বিভাগে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন সম্পর্কে ডঃ বৃন্দাবন বসাক লিখেছেন—"1837তে ফিলাডেলফিয়ার হাস-পাতালে ডাঃ টমাস মর্টনের কাছে 15 বছরের এক তরুণকে আনা হল। সাংঘাতিক পেট বেদনা ও বমি। মর্টন দেখলেন অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে। তখন পর্যন্ত ঐ রোগের জন্য অপারেশন করার কথা হয়নি। মর্টন দেখলেন ঐ ফোলা অ্যাপেনডিক্স কেটে বাদ না দিলে রোগী বাঁচবেনা। ভাবনা চিন্তা করে তিনি অ্যাপেনডিক্স কেটে বাদ দিলেন, রোগী বাঁচল। তারিখটা হল 1887 সালের 27 এপ্রিল।"—উনি দু জায়গায় দুটি সাল ব্যবহার করেছেন যার ব্যবধান 50 বছর কোনটি ঠিক? না কি ছাপার ভুল?

(2) শরীর স্বাস্থ্য বিভাগে ডায়া-বেটিস প্রসঙ্গে দেবব্রত রায় লিখেছেন: "ভাবলে আশ্চর্য লাগে প্রতিদিন একজন সুস্থ সবল মানুষের ক্ষেত্রে কম বেশী 170 লি. জল Renal Tubule এ ঢুকে।"—তা এই আশ্চর্য কার্যটা তিনি যদি এই পত্রিকা মারফত অথবা আমাকে চিঠি মারফত জানান ভালই হয়। উনি আরেক জায়গায় লিখেছেন অগ্ন্যাশয়ের দুটি কোষ L কোষ ও B কোষ। কিন্তু আমরা পড়েছি ও দুটো আলফা ও বিটা কোষ। তিনি যদি এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী উঃ 24 পরগনা

আবিষ্কারের গল্প ঃ লেখকের উত্তর

1. ননীগোপাল মণ্ডল (বামনসরিষা, লাল নগর, মেদিনীপুর) মহাশয়ের (June '88) পত্রের উত্তর ঃ ননীগোপালবাবু, আপনার চিঠিতে আবিষ্কারের গল্প হিসেবে কি ধরনের মুখরোচক গল্প পছন্দ করেন জানালে ভালো করতেন। কারণ সব আবিষ্কারের গল্পের মধ্যেই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-এর আবিষ্কারের মত রোমাঞ্চকর গল্প থাকে না। আর যদি রোমাঞ্চকর বা মজার বা মুখরোচক গল্প ছাড়া অন্য আবিষ্কারের গল্পতে আগ্রহী না হন তাহলে আমি নিরুপায়; কারণ আমি তো ঘটনারই বিবরণ দিচ্ছি মাত্র তবু ননীবাবুর জন্য মোটর সাইকেল আবিষ্কারের গল্পের মধ্যে আরও যতটুকু রস আছে তার সবটুকুই নিংড়ে দিচ্ছি। গটলি এবং ডেমলারকে অটোমোবাইলের জনক বলা হয়। তিনি জার্মানীতে ছিলেন। তার সঙ্গে আরও এক জার্মানীর নাম পাওয়া যায় উইল হেম মে ব্যাক, যিনি গটলি-এর সহকারী ছিলেন। প্রথম যে মোটর সাইকেলটি তৈরি করেছিলেন তার চাকা ছিল কাঠের এবং ফ্রেমটিও ছিল কাঠের। অবশ্য এর মাঝে একজন ইংরেজ এডওয়ার্ড বাটলার আবিষ্কারকের দাবীদার ছিলেন। কিন্তু পেটেন্ট নেওয়ার সূত্রে গটলি এবং ডেমলারকেই মোটর সাইকেলের আবিষ্কর্তা বলা হয়।

2. অয়ন গোস্বামী, (সাদিঘাঁর দেয়াড়) মহাশয়ের (August' 88) পত্রের উত্তর ঃ অয়নবাবু, আপনার এই পত্র শুধুমাত্র আমাকেই অপমান করেনি। এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কেও করেছে। আপনার পত্রের অর্থ এই রকম দাঁড়ায় যে তিনি অজ্ঞানতাবশতঃ একজন অজ্ঞ এবং অবিবেচক লোককে আবিষ্কারের গল্প লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। যে প্রতিমাসেই আবিষ্কারের গল্পের আবিষ্কারকের নাম ভুল করে অথবা এড়িয়ে যায়। কিন্তু আপনি উদাহরণ হিসেবে শুধু মাত্র জুন '88 এর কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এই আবিষ্কারের গল্প প্রায় তিন বছর ধরে চলছে এবং কম করে কুড়িটি আবিষ্কারের গল্প লেখা হয়েছে তবুও মাত্র একটি উদাহরণ দিয়েই আপনি নির্ভয়ে বলে দিতে পারলেন "প্রতি মাসেই ....।" কিন্তু অয়নবাবু এই এত দিন অবধি আপনি অপেক্ষা করছিলেন কেন? আমার অজ্ঞতার সীমা কতদূর তা দেখার জন্য?

যাইহোক আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, ক্যামেরা (camera) একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ ঘর (room) এবং যে শব্দটা কিছুটা বিকৃত হয়ে আমাদের বাংলা ভাষাতেও ঢুকে গেছে। যেমন আমরা বলি দু-কামরার ফ্ল্যাট ইত্যাদি। এই ক্যামেরা আবিষ্কারের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরার (camera obscura—অন্ধকার ঘর) মধ্যে। (এই ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরা থেকেই পরে পিন হোল ক্যামেরা আসে।) এই ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরার সম্ভাবনা প্রকৃতির মধ্যে প্রথম দেখেন অ্যারিসটটল। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়ে মাটির উপর

মঙ্গল গ্রহ

গত জুলাই 88 সংখ্যায় শ্রীসৌগত দত্ত ও শ্রী অরিন্দম রক্ষিত লিখিত রিচার্জেবল্ টর্চে [নিজে নিজে কর] একটি ডায়োড [Type IN4005]-এর পজিটিভ পয়েন্টটা ভেরোবোর্ডের কোথায় বসবে তা এঁকে দেওয়া নেই।

সেপ্টেম্বর '88 সংখ্যায় রবীন বসু মহাশয় লিখিত নিকটবর্তী মঙ্গল প্রবন্ধে লিখেছেন যে, মঙ্গলের অক্ষ হলে 25° কক্ষতলে। "ঐ তথ্য ভুল। আসলে ওটা হবে 14° কক্ষতলে। ঐ সংখ্যায় প্রচ্ছদ নিবন্ধে বেশ কথাটা ভুল রয়ে গেছে। লেখক দীপাঞ্জন মিত্র; তাঁর নিবন্ধের একটি জায়গায় রূপার ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে গেলে কি দ্রবণ ব্যবহার করা হবে, সেখানে লেখা আছে $Agno_8$ আসলে "n"টি বড় হরফের হলেই তবে আণবিক সংকতটি ঠিক হবে। আবার, সিলভার নাইট্রেট-এর ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমীকরণ দেওয়া আছে $AgNo^3 \rightleftharpoons Ag + No_8$। কিন্তু সমীকরণে $AgNo^3$ "3" টি হবে নীচে ও Ag আয়নটি যে পজিটিভ (+) আয়ন হবে, তার উল্লেখও সমীকরণে নেই। "পড়াশুনা" বিভাগে শ্রীঅমর নাথ মহাশয়, সোডিয়াম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সোডিয়াম পাইরোবোরেটের সংকেত দিয়েছেন $Na_2\ B_4O_7,\ 10\ H^2O$ এখানে সেই একই ভুল, হবে $Na_2B_4O_7, 10H_2O$ ঐ সংখ্যায় 66 পৃষ্ঠায় শ্রীশচীনন্দন আঢ্য লিখিত "মহাদেশ আটলান্টিক" প্রবন্ধে সমুদ্রের তলায় সাজানো পাথরগুলির বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে কার্বোন সেটিং পদ্ধতিতে বলেছেন। কিন্তু কথাটা কার্বোন সেটিং নয় হবে কার্বন ডেটিং।

আশাকরি আমাদের প্রিয় সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে নজর দেবেন।

সোমনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা-26.

আলোর বৃত্ত দেখে তিনি বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন। দশম শতাব্দীতে আলহাজেন নামের এক আরবীয় প্রথম ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরা তৈরি করেন এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তার নোট বইতে 1490 সালে এই ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরার বর্ণনা দেন।

পরে এই ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরার উন্নতি ঘটিয়ে 16 শতাব্দী থেকে এর ব্যবহার শুরু হয় মূলত কোন বস্তুর স্কেচ করতে বা ছাপ তুলতে। এবং পরে ছবি আঁকিয়েদের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসেবে এটি ব্যবহার হতে থাকে।

লুই ড্যাগেরার এবং উইলিয়াম হেনরি ফকক্স ট্যালবট যাঁদের আলোক চিত্রীদেরপুরোধা বলা হয় প্রথম জীবনে ছবি আঁকিয়ে ছিলেন। এবং এই ক্যামেরা অব্‌স্‌কুরার পর্দায় যেখানে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে সেখানে সাধারণ কাগজের বদলে ক্যেমিক্যাল লাগানো কাগজ ব্যবহার করেন। এই ভাবে পিন হোল ক্যামেরার সাহায্যে প্রথম ছবি তোলেন। অর্থাৎ ক্যামেরা অব্‌স্‌কুরা অন্য অর্থে পিন হোল ক্যামেরাই হল প্রথম ক্যামেরা যা দশম শতাব্দীতে অর্থাৎ 400 বছরেরও বেশি আগের ঘটনা, এবং যা ছক তোলার জন্য ব্যবহার হয়1835—1839 সালে।

জর্জ ইষ্টম্যান যিনি পেশায় একজন ব্যাঙ্কের কেরাণী সখের আলোক চিত্রী ছিলেন। তার আবিষ্কৃত কোডাক ক্যামেরা। ক্যামেরার ইতিহাসে অনেক পরের ঘটনা। তার আবিষ্কৃত ক্যামেরায় ফিতার আকৃতির গোটানো ফিল্ম ব্যবহার হত। এক একটা ফিল্মে 100টা ছবি তোলা যেত, তার আবিষ্কৃত কোডাক ক্যামেরাকে আধুনিক ক্যামেরার প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে। Kollfilmও আবিষ্কার করেন ইষ্টম্যান 1889 সালে।

জর্জ ইষ্টম্যানও ঐ পিন হোল ক্যামেরা ব্যবহার করে প্রথম জীবনে ছবি তুলেছেন এবং ভালো single piece negative (Dry plate) আবিষ্কার ক'রে 1881 সালে 1 লা জানুয়ারী নিউইয়র্কের রচেসটারে 'ইষ্টম্যান ড্রাইপ্লেট কোম্পানী' খোলেন। পরিশেষে আমি এইটুকু বলতে পারি যে জর্জ ইষ্টম্যান ক্যামেরার অনেক উন্নতি সাধন করেছেন কিন্তু তিনি প্রথম আবিষ্কারক নন।

3. জগদীশ চক্রবর্তী (মেদিনীপুর) মহাশয়ের (August'88) পত্রের উত্তর ঃ জগদীশবাবু আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। আবিষ্কারের গল্প, গল্পচ্ছলেই লেখা। মূল গল্পটি দাঁড় করানোর জন্যই জিজ্ঞা নামক চরিত্রের আবির্ভাব। লেখাটি লেখা হয় সরস নিবন্ধের ধাঁচে। অন্যান্য বিজ্ঞানের তথ্যে ঠাসা লেখার মধ্যে আরেকটি শুধু তথ্য নির্ভর লেখা থেকে পাঠকেরা যাতে মুখ না ফেরায় তার জন্যই মূল ব্যাপারটিকে বজায় রেখে একটু সাহিত্য রসের অবতারণা। আমি আপনাদের কাছে তাই এখন আপনাদের ইচ্ছেটা জানতে চাই, আপনারা যে ধরনের চাইবেন সে ভাবেই আমি পরিবেশন করবো।

অলয় ঘোষাল, কদমতলা, হাওড়া।

জীবাণু ও ভাইরাস

পত্রিকার (জুলাই) 42 পৃষ্ঠায় অয়ন মজুমদার ও সৌমেন মজুমদার ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে যে প্রশ্নোত্তর লিখেছেন তার 3 নং প্রশ্নের উত্তর সঠিক নয়। ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানী লিউয়েন হুক ভাইরাস আবিষ্কার করেন। কিন্তু 1675 খ্রীস্টাব্দে উক্ত বিজ্ঞানী জীবাণু আবিষ্কার করেন, জীবাণু এবং ভাইরাস কখনও এক জিনিস নয়। উক্তবিজ্ঞানী কোনদিনই ভাইরাস সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি। বিজ্ঞানী জেনার (1746) বিজ্ঞানী আইভানওস্কি, বিজ্ঞানী টাকাহাসি (1933) প্রমুখ ভাইরাস আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ পত্রিকাটি 59 পৃষ্ঠায় জোনাকিদের দেহস্থ আলোকের উৎস্য সম্বন্ধে যে কারণ দেওয়া হয়েছে তাতে প্রধান কারণটাই লেখা হয়নি। জোনাকীদের দেহ থেকে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তা শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্নশক্তির রূপান্তর। এই প্রধান উৎস্যটা না লিখলে উত্তরটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তৃতীয়ত ঐ পত্রিকার (জুলাই) 61 পৃষ্ঠায় ভিটামিন E-এর অভাবজনিত ফল জানতে চাওয়া হয়েছে। ঐ প্রশ্নের উত্তরে কিছুই লেখা হয়নি এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছে এর অভাবে কোন রোগ হয়না বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু আমি তিনটি বইতে ভিটামিন E-এর নিম্নলিখিত অভাবজনিত ফলগুলি পেলাম। (i) জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু (ii) জননাঙ্গের কার্যক্ষমতা হ্রাস (iii) স্তনদুগ্ধ নিঃসরণ কমে যাওয়া (iv) শুক্রাণু সৃষ্টি ব্যাহত প্রভৃতি।

ওমর আহমেদ সৈদপুর, টাকী উঃ 24 পরগনা

আবার মঙ্গলে

সমরজিৎ কর

সৌর জগতের সেই লোহিত গ্রহের রহস্য উদ্ঘাটনে আবার শুরু হয়েছে নতুন অভিযান। এ অভিযান সোভিয়েত দেশের। এর জন্যে তাঁরা ব্যবহার করছেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দুটি মহাকাশযান। মহাকাশযান দুটির তাঁরা নাম দিয়েছেন ফোবোস-1 এবং ফোবোস-2। জানো নিশ্চয়—লোহিত সেই গ্রহ, পৃথিবী থেকে যাকে দেখায় একটি লাল রঙের তারার মত—যার নাম মঙ্গল, তার দুটি উপগ্রহ। একটির নাম ফোবোস, অপরটির নাম ডিমোস। বিজ্ঞানীরা ফোবোসের নামেই নাম রেখেছেন ওই মহাকাশযান দুটির।

এ বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মহাকাশে উৎক্ষেপ করা হয়েছে ফোবোস-1 কে। তার পরের সপ্তাহে ফোবোস-2। এ বছর মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি সরে আসছে। পাঁচ কোটি মাইলের কিছু বেশি দূরত্বের মধ্যে। পৃথিবী এবং মঙ্গলের মধ্যে দূরত্ব কম হওয়ায় যান দুটিকেও পাড়ি দিতে হবে কম দূরত্ব। এর জন্যেই এই সময়ে পাঠান হল মঙ্গলের উদ্দেশ্যে দুটি মহাকাশ যান।

সোভিয়েত মহাকাশবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ফোবোস-1 এবং ফোবোস-2 আগামী ছয় মাসের মধ্যে মঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হবে। তারপর মঙ্গলের চারপাশে পরিক্রমণ করতে থাকবে উপগ্রহর মত। এক সময় ফোবোস-1 মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোসের পৃষ্ঠতলের 50 মিটারের কাছাকাছি গিয়ে ওই উপগ্রহটির ভূতাত্ত্বিক অবস্থা, মাধ্যাকর্ষণ বল, প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে, এ কথাও জানিয়েছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। এবারের অভিযানের এই অংশটিই হবে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। ফোবোস-1 যান থেকে লেজারের সাহায্যে উপগ্রহটির মাটিও পরীক্ষা করা হবে। এতে সফল হলে পৃথিবী থেকে বেতার সংকেত পাঠিয়ে ফোবস-1 অথবা ফোবোস-2 যান থেকে ফোবোস উপগ্রহের উপর নিক্ষেপ করা হবে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। এই কাজটিও হবে খুবই কঠিন। কারণ ওই উপগ্রহটির মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র; উপগ্রহটির আয়তন খুবই ছোট বলে। যতদূর জানা গেছে, এই উপগ্রহটি লম্বায় 17 কিলোমিটার এবং চওড়ায় 23 কিলোমিটার। মাধ্যাকর্ষণ বল এত কম হওয়ায় তার বুকে যন্ত্রটির দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত হবে। বরং বিচ্যুত হয়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে পারে। তাই যন্ত্রটিকে বিশেষ পদ্ধতিতে উপগ্রহটির বুকে আটকে রাখারও ব্যবস্থা হয়েছে, এটিও উপগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।

দুটি মহাকাশযানই মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ ফোবোস এবং ডিমোসের উপর পর্যবেক্ষণ শেষ করে ফিরে আসবে দুটি বৃত্তাকার কক্ষ পথে। সেই কক্ষপথ ধরে প্রতি আট ঘণ্টায় মঙ্গলের চারপাশে চলবে তাদের পরিক্রমণ। এবং তা চলবে মোট 140 দিন।

এবারের মঙ্গল অভিযানের মূল উদ্দেশ্য দুটি। পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দিকে যাওয়ার পথে উপগ্রহদুটি সূর্য সম্পর্কে সংগ্রহ করবে নানান তথ্য। সূর্য থেকে সৌরমণ্ডলের সর্বত্র ছড়াচ্ছে পারমাণবিক কণা বিশেষ করে প্রোটন। বাতাসের প্রবাহ যেমন ঝড় সৃষ্টি করে, তেমনি এই সব কণাও সৃষ্টি করে ঝড়। বিজ্ঞানীরা যাকে বলে থাকেন ঝড়। এই সৌর ঝড়ের রহস্য জানা গেলে আমরা পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলেরও অনেক রহস্য জানতে পারবো। অবশ্য এর আগেও বহু মহাকাশযান থেকেও এ ধরনের কাজ করা হয়েছে। তবু বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এবারের অভিযানে হয়ত আমরা এমন এক তথ্য জানতে পারবো, যা আগে কখনো জানা যায় নি।

দেখা গেছে, কয়েক দশক ধরে ফোবোসের পরিক্রমণ বেগ ধীরে ধীরে যেন বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে যত দ্রুত মঙ্গলের চার পাশে পরিক্রমণ করত, এখন তার চেয়ে আরো দ্রুত মঙ্গলের চারপাশে পরিক্রমণ করছে। এটা কতটা সত্য? অনেকের ধারণা ডিমোস এবং ফোবোস এক সময় মঙ্গলেরই অংশ ছিল। কোন এক সময়ে অতিকায় কোন গ্রহণুর ধাক্কায় মঙ্গলের কিছু অংশ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই সব টুকরোরই দুটি এখনকার দুটি উপগ্রহ ফোবোস এবং ডিমোস। এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন। আসলে ওই উপগ্রহ দুটি উল্কাপিণ্ডের মত দূরাকাশে বিচরণ করত। কোন অজ্ঞাত কারণে কোন সময় তারা মঙ্গলের কাছাকাছি আসে। তখন

মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের টানে বন্দী হয়ে উপগ্রহের মত মঙ্গলের চারপাশে বিচরণ করতে থাকে—চাঁদের মত। এই দুটি ধারণার মধ্যে কোনটি সত্যি? অথবা এদের কোনটিই কি সত্যি? এবারকার অভিযানে এটাও খতিয়ে দেখা হবে।

গত কুড়ি বছরে সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকগুলি মহাকাশযান মঙ্গলের খবরাখবর জানতে পাঠিয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে মার্কিন মঙ্গলযান ভাইকিং মঙ্গলের বুকে নেমে নানা রকম তথ্যও সংগ্রহ করেছে। অন্যগুলিও অবশ্য করেছে। জানা গেছে, মঙ্গলের বাতাসে জলীয় বাষ্প নেই বললেই চলে। সেখানকার বাতাসের প্রধান উপাদান কার্বন ডাই অক্সাইড। সেখানে অতিকায় একটি মৃত আগ্নেয়-গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে। যার নাম রাখা হয়েছে ওলিমপাস মোন্‌স। যার উচ্চতা 27 কিলোমিটার। লম্বায় 4000 কিলোমিটারের মত। এই গ্রহটিতেও রয়েছে চৌম্বক ক্ষেত্র। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, পৃথিবীর গভীরের বস্তু সামগ্রী উত্তপ্ত তরল অবস্থায় রয়েছে। এবং যা কাজ করছে অতিকায় একটি ডায়ানামোর মত। সৃষ্টি করছে বিদ্যুৎ। তার ফলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে সৃষ্ট হয়েছে চৌম্বক ক্ষেত্র। যদি তাই হয়, মঙ্গলের গভীরেও কি রয়েছে উত্তপ্ত তরল সামগ্রী? এসব নিয়েও গবেষণা চালাবে সোভিয়েত দেশের দুটি মহাকাশ যান। মঙ্গলে প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। ভাইকিং যানের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে একথা বলেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এ কথা কতটা সত্য, সেটাও যাচাই করা হবে এবার। সম্ভবত মঙ্গলে মানুষের অবতরণ করার মত জায়গাও আবিষ্কার করার চেষ্টা হবে। আর এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা নেবেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। যতদূর জানা গেছে এ কাজটি তাঁরা 2010 সালের মধ্যেই সারবেন।

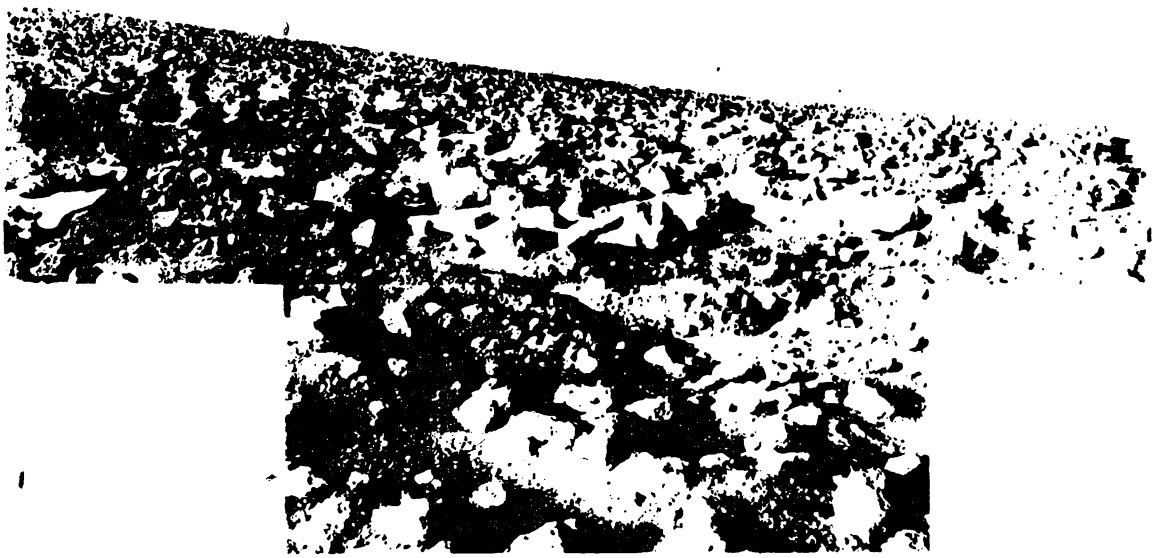

ভাইকিং ল্যাণ্ডার থেকে তোলা মঙ্গলের ইউটোপিয়া প্ল্যানিশিয়া অঞ্চলের ছবি। দূরে ঐ অঞ্চলের দিক্ বলয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর

অব্যক্ত

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ।। দাম ১৫·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

অজয় হোম

শ্যেন বর্গে (অর্ডার ফালকনিফরমেস) দুটি বংশ বাজ—বংশ (অ্যাকমিপিট্রিদি) ও শ্যেন বংশ (ফালকনিনি)। বাজ বংশের মধ্যে বাজ, শকুন, চিল, ঈগল ইত্যাদি আর শ্যেন বংশে শ্যেন, ধূতি (হবি), তরুমতি (মার্লিন), পোকামারা (কেস্ট্রেল) প্রভৃতি।

বাজ বংশ 24টি গণ (জিনাস)। যথাক্রমে বাজি (অ্যাকসিপিটার), ভাসক (নেফ্রন), পাণ্ডুর (জিপস্), শ্যাবগৃধ্র (ঈজিপিয়াস), কর্ণগৃধ্র (টারগাস), ভাস (গাইপীটাস), দীর্ঘশিখ (লোফোট্রি অরকিস), কপোতারি (হিরাঈটাস), গরুড় (অ্যাকুইলা), তিলাধারি (ফিলেরনিস), সরটারি (বুটাস্টুর), (খগ আভিকেদা), মধুবা (পেরনিস), ভ্রামিক (সারকাস), শর্বলিকা (এলানাস), চক্রচারি (সার্কাঈটাস), কুরর (পানডিঅন), চিরম্মন (মিলভাস) মুষকাদ (বুটিও), মীনাশ (ইকথাইওফাগা), উৎক্রোশ (হোলিঈটাস) এবং লৌহপুচ্ছ (হেলিয়াস্টুর)। আর শ্যেন বংশে দুটি বংশ—ক্ষুদ্রশ্যেন (মাইক্রোহিয়েরাক্স) ও শ্যেন (ফালকো)।

বাজ বংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চক্ষু বেঁটে এবং উপরের চক্ষু তলার চক্ষুর চেয়ে আকারে বড়ো, বাঁকা ও ডগা বঁড়শির ন্যায় বাঁকানো। উপরের চক্ষুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী, সাধারণত উজ্জল রঙের, এর মধ্যে নাকের ছাঁদা। পা শক্ত সমর্থ এবং বাঁকানা শক্তিশালী নখর। এই বংশের স্ত্রী-পাখিরাই আকারে বড়ো এবং শিকারেও পারঙ্গম পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি।

শ্যেন বংশের (ফালকনিদি) পাখিদের ডানার পালক বড়ো এবং হাওয়াশীলদের (সোয়ালো) মতো তীক্ষ্ণাগ্র। চোখের পাশে গালের উপর কালো ছোপ।

সময়টা 1933 হবে। আমরা অর্থাৎ কার্তিক বসু, তার ভাই বাপী বসু ও আমি পাখি পোষা শুরু করি। সবই ডাকা বা শিস্ দেওয়া পাখি। হাতিবাগান বা রথের হাট থেকে কেনা। রোজই বিকেলে কার্তিক,বাপী আর আমার এই তিনজনের মধ্যে পাখি নিয়ে নানা কথাবাতা জল্পনা-কল্পনা চলত। একদিন কার্তিক-বাপীর বড়ো ভাই হিতেন্দ্র মোহন অথ'াৎ হিতেনদা আমাদের পাখির আলোচনায় এসে বললেন, তোরা পাখি পুষছিস খুব ভালো কথা। সত্যিকারের পাখি পুষতে হলে নবাব-বাদশাদের যে পাখি পোষার চল ছিল সেই পাখি পোষ। আমরা সবাই জানতে চাই সে কী পাখি! উনি বললেন, বাজ পাখি। এই বলে একটা ফার্সি বই বের করলেন তাঁর আলমারি থেকে এবং তার থেকে পড়তে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন বাজ পাখির মহিমা। তাঁর কাছে জানলাম ক্যাপটেন ডি সি ফ্লিট-এর

ইংরেজিতে অনুবাদ করা 'বাজনামা-ই-নাসিরি' বই-এর কথা। সেই বই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির, যা এখনকার 'ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি'তে পাওয়া যাবে।

ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু ঐ লাইব্রেরীতে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে 'বাজনামা-ই-নাসিরি' বইটা এনে কপি করে ফেরত দেন। বইটি বেশি বড়ো ছিল না, শ' দেড়েক পার্তার মতো বই। তারপর পাতিপুকুরের পাখি ধরা বেদে সতীশ-চারুদের দিয়ে একটা শিকরে বাজ (ইণ্ডিয়ান শিকরা) ধরার পর বই-এর লেখা মতো ত্রিশ দিনের শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। প্রথম ছিল—ম্যানিং অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে পরিচয়। পাখিরা মানুষের হাতকে বড়ো ভয় পায়। দুপা'য়ে সরু লাল ফিতে বেঁধে উইকেট কিপিং গ্লাভসের উপর ডান হাতে বসিয়ে সর্বক্ষণ তাকে নিয়ে ঘোরাফেরা। মাঝে মাঝে বাঁ হাতটা ওর মুখের সামনে এনে মাথার উপর দিয়ে লেজ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেওয়া। এই ভাবে ম্যানিং-এ অভ্যস্ত করতে হয়। তারপর কোনো গাছের ডালে বা চেয়ারের পিঠের উপর বসিয়ে দিয়ে হাতে মাংসের টুকরো নিয়ে একটু দূরে থেকে ডাকা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়ে প্রস্তুতি। পাখি তৈরি হলে আণ্ডার হ্যাণ্ড থ্রো সিস্টেমে শালিক বা কোনো ছোটো পাখির উপর ছাড়তে হয়। অর্থাৎ পা লম্বা করে ধরে লেজের সঙ্গে রেখে ডান হাতের মুঠোয় ধরে ছুঁড়তে হয়। পাখি চলে যায় যার উপর ছোঁড়া হয়েছে তার দিকে। সেই পাখি পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু হাতে ছোঁড়া বাজ নির্দিষ্ট পাখিকে পুরো কবজা করে ডাকে। তখন ছুটে গিয়ে ধরা পাখির গলা ছুরি দিয়ে কেটে টাটকা রক্ত পান করাতে হয়। পরে একটু কলজে ও মেটে খেতে দিতে হয়। তারপর চলতে হয় অন্য পাখির উপর ছাড়ার জন্যে। এই হল শিকরে বাজকে দিয়ে শিকারের মোটামুটি রূপ কায়দা শেখানো।

শিকয়ে বাজটাকে হাতে নিয়ে চলেছি। দেখি প্রায় 15-20 মিঃ দূরে এক ছোটো জলার ধারে একটা কোঁচ বক (পণ্ড হিরণ) বসে আছে। আমার আড়াল থেকে কার্তিকদা শিকরেটাকে তার শিকার বস্তুকে দেখাল। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার আর থ্রো বা ছোঁড়া নয়। পাখিটা হাত থেকে উড়ে চলে গেল একটু উপরে যাতে শিকার বকটা জলার দিকে না যেতে পারে সেই দিক থেকে ঘুরে আসছে। বকটা প্রাণ ভয়ে জলা ছেড়ে উলটো দিকে এদিক ওদিক এঁকে বেঁকে উড়তে লাগল। কিন্তু পাখিটা উপর থেকে নেমে এল বজ্রসম, পিছনের নখর দিয়ে মারল মাথায়। একটা শব্দের সঙ্গে কতকগুলো পালক এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। বকটা মাটিতে পড়ছে, ও-ও সঙ্গে নামছে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথা গলা চেপে ধরে নখর বসিয়েছে। এই ভাবে শিকার করাকে 'দস্তান' বলে।

পাখিটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) বাজ-গণের (অ্যাকসিপিটার) শিকরে বাজ (অ্যাকসি-পিটার বেডিয়াস), ইংরেজি—ইণ্ডিয়ান শিকরা, হিন্দী—শিকরা। পুরুষ—চিপক, চিপকা। লম্বায় 26 সেমি (12-14 ইঞ্চি), পুরুষ চিপক 36 সেমি (12-14 ইঞ্চি)।

অপরিণতদের চেহারা: উপরটা গাঢ় পাট-কিলে; লেজে 5 থেকে 7টি কালো পটি; বুকটা সাদা, তার উপর চওড়া করে লম্বালম্বি পাটকিলে ছিট ও ছোপ। পূর্ণবয়স্ক: উপরটা ছাই নীলচে-ধূসর। নিচে সাদার উপর খুব ঘন করে মরচেটে পাটকিলের আড়াআড়ি সরু টান, বিশেষত বুকের উপর। গলায় ধূসর টান। স্ত্রী-পুরুষ একই প্রায় দেখতে, স্ত্রী-পাখি আকারে অল্প বড়ো এবং ধোয়াটে পাটকিলে আর ধূসরের পোঁচ। উভয়ের কনীনিকা সোনালি বা কমলা-হলুদ, চঞ্চু স্লেট নীল, গোড়ায় ফিকে কালো, মুখ গহ্বর হলদেটে, চঞ্চুর গোড়ায় অনাবৃত ঝিল্লী উজ্জ্বল হলুদ বা গাঢ় কমলা, পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান—পাকিস্তান, সিন্ধু থেকে নেপাল, সারা ভারত, একমাত্র কেরালা ও আসাম ছাড়া 1400 মি উচ্চতায় হিমালয়ে। দেখা যায় খোলা-

মেলা জঙ্গল, পাহাড় ও সমতলে গাঁ ও খেতের ধারে। আরও কয়েকটি শিকরে—**সিংহলী শিকরে** (অ্যা বে পলিওপসিস।) লম্বায় 31 থেকে 36 সেমি (12-14 ইঞ্চি। দেখা যায় আসামে 900 মি উচ্চতার মধ্যে, বর্মা, থাইদেশ, মালয় থেকে পুবে ইন্দোচীনীয় দেশ সমূহ থেকে হাইনান ও ফরমোসা। **কার নিকোবর শিকড়ে** (অ্যা বে বাইলেরি)। লম্বায় 30 সেমি (12 ইঞ্চি)। দেখা যায় কার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। **কচ্ছল শিকরে** (অ্যা বে অবসোলিটাস)। লম্বায় 33-34 সেমি (13-14 ইঞ্চি)। লেজে একটি মাত্র টান। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কচ্ছল দ্বীপের বাসিন্দা।

খাদ্য—করায়ত্ত করা যায় এমন ছোটো স্তন্য-পায়ী, যেমন ধেড়ে ও নেংটি ইঁদুর, কাঠবিড়ালী . পাখির মধ্যে চড়াই, শালিক ছাতারে, বটের, ঘুঘু, ফিঙে, ভীমরাজ . অন্যান্যদের মধ্যে টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ, পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং, গাং ফড়িং, উড়ন্ত পিঁপড়ে ইত্যাদি। গৃহপালিত মুরগীর ছানাও তুলে নিয়ে যায়। ডাকে টিঁটিউ, টিঁটিউ, টিঁটুই, ইঁহিয়া-ইঁহিয়া ইত্যাদি।

বাজের (গোশক) কায়দাতেই শিকরে পাতা ভরা গাছের ডাল থেকে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে শিকার ধরে। ঝোপের তলায় যখন বটের বা ঐ জাতীয় পাখির দলকে তাড়া লাগিয়ে একটিকে পছন্দ করে ঝড়ের বেগে নখরের আঘাতে কাবু করে। ডানার ঝাপট এবং দ্রুত ভেসে চলাই ধরন। ফিঙে ও কাঠবিড়ালীরা দেখতে পেলেই অন্য পশুপাখিদের ওই শিকরের ডাক নকল করে ডেকে সতর্ক করে দেয় সাক্ষাৎ যম আসছে বলে। অনেক সময় দেখা যায় খুব উঁচুতে আকাশের বুকে এক জোড়া ভেসে ভেসে উড়ছে এবং প্রজননকালে জোড়ায় নানারকম ওড়ার কসরতও দেখায়। ভারতে যখন বাজ পাখি দিয়ে শিকারের একটা ঐতিহ্য ছিল তখন শিকরে দিয়ে ধরা হতো বটের, তিতির, কাক, এমনকি ময়ূর ছানাও।

শিকরে মোটামুটি এক দেখতে হলেও প্রত্যেকের একটা আলাদা রূপ আছে। যেমন, কারুর উপর খাকির আভা, কারুর পাটকিলে, কারুর কালচে, কারুর বা লালচে এবং কারুর সাদাটে। কম করে 19-20টিকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করার মধ্যে কার্তিকদা আর আমি লক্ষ্য করেছি সাদাটে অর্থাৎ দুধিয়ালরাই শ্রেষ্ঠ। গত 10 5.84তে ওড়িশার সিমলিপালের বড়েহীপানিতে যে শিকরে ও চিপক জোড়াটা আমায় অভিনন্দন জানাতে হাত দশেকের মধ্যে এসেছিল তারা ছিল দুধিয়াল।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন তবে এপ্রিল মে-তেই বেশি দেখা যায়। বাসার উপাদান সরু সরু শুকনো গাছের ডাল লাইনিং দেয় ঘাস ও সপ শিকড়ের। কাকের বাসার মতই দেখতে। 30 সেমি চওড়া, গভীরতা 10 সেমি। বাসা বাঁধে আম, নিম, তেঁতুল ইত্যাদি ঘন পাতার গাছে। বাসা বানায় স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পায়ে করে শুকনো গাছের কাঠিডাল এনে। ডিম পাড়ে 3-4টি ক্বচিৎ 5টি নীলাভ-ধূসর, তার উপর দেখা যায় বিশেষত মোটার দিকে একটু কালচে ধূসরের ছোপ থাকে। 18-23 দিনে বাচ্চা ফোটে। সন্তান প্রতিপালন দুজনেই করে। ডিমের গড় মাপ 38·8 × 3. 1 মিমি।

তলোয়ারের খাপ

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

একটা মজার গল্প শুনেছিলাম একবার। রাজায় রাজায় তলোয়ার যুদ্ধের গল্প। দুই রাজার তলোয়ার খেলা দেখতে অনেক দর্শক। কে হারে, কে জেতে। হার মানে মৃত্যু। অর্থাৎ কে কাকে মেরে ফেলে জিততে পারে তারই লড়াই। দুজনই খুব রেওয়াজ-টেওয়াজ করেছে। কলা-কৌশল শিখেছে। অভিজ্ঞ কারিগর দিয়ে তলোয়ারও বানিয়েছে। সবাই উৎসুক হ'য়ে আছে কখন মাঠে নামবে রাজারা। যথা সময়ে প্রথম রাজা এলো। বিশাল শক্তি-শালী চেহারা। শক্ত পেশীর হাত। ঝকঝকে নতুন খাপ শুদ্ধ তলোয়ার কোমর থেকে ঝুলছে। ফুট দুয়েক লম্বা কিন্তু বেশ চাওড়া আর ভারি। সবাই বলল এই তলোয়ারের এক কোপ সামলাতে পারবে না দ্বিতীয় রাজা। এবার দ্বিতীয় রাজা ঢুকলো। কোমরের তলোয়ার দেখে সবাই থ। অন্তত ছ'ফুট লম্বা খাপসুদ্ধ তলোয়ার। সহকারী মন্ত্রী এসে রাজাকে মাঠ পর্যন্ত দিয়ে গেল। অত লম্বা তলোয়ার ত তাই আর একজন না হলে বয়ে বেড়ানো মুশকিল। লম্বা তলোয়ার কি ভেবে বানিয়েছে রাজা তা সবার বুঝতে অসুবিধা হল না। দূর থেকে প্রথম রাজার মাথা নেবে কেটে। ফল কি হ'ল জানো ত? সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুজন খাপ থেকে তলোয়ার বার করল। বার করতে কি আর পারল? দ্বিতীয় রাজা তলোয়ারের হাতল ধরে টান মেরে পুরো হাত ওপরে ওঠালো বটে কিন্তু ছ'ফুট তলোয়ারের সবটা খাপ থেকে বেরোলো না। বেরোতে পারেও না। সুতরাং...

এখানে ছবিতে দ্যাখো খাপে ঢাকা নয় খাপ এবং তলোয়ার আলাদা ভাবেই রাখা আছে। অনেক জোড়া বিচিত্র চেহারার তলোয়ার আর তাদের খাপ। তুমি ভাল করে দেখে বলো সব তলোয়ার আর তাদের খাপগুলো ঠিক ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা। যদি না হয় তাহলে কোন্ কোন্ জোড়া সঠিক বেছে ফেল।

উত্তর আগামী সংখ্যায়।

বুদ্ধিশুদ্ধি : ম্যাজিক স্কোয়ার-এর উত্তর।

816	438	294	672	618	276	492	834
357	951	753	159	753	951	357	159
492	276	618	834	294	438	816	672

ভগ্নাংশের ল. সা. গু এবং গ. সা. গু.

অসীম মুখোপাধ্যায়

তিনটি বাজনা $\frac{2}{3}$ ঘণ্টা, $\frac{3}{4}$ ঘণ্টা এবং $\frac{1}{5}$ ঘণ্টা অন্তর বাজে। বাজনা তিনটি একত্র বাজা শুরু করলে, কতক্ষণ পরে বাজনা তিনটি আবার একত্র বাজবে? এই সময়টি নির্ণয়ের জন্য $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ এবং $\frac{1}{5}$ ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু. নির্ণয়ের আবশ্যক। এই নিবন্ধে ভগ্নাংশের ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু. নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উপরোক্ত সমস্যায় ভগ্নাংশগুলিকে সহজেই পূর্ণ সংখ্যায় পরিবর্তিত করা যায়, যেমন—$\frac{2}{3}$ ঘণ্টা $=40$ মিনিট, $\frac{3}{4}$ ঘণ্টা $=45$ মিনিট এবং $\frac{1}{5}$ ঘণ্টা $=12$ মিনিট। এখন 40 মিনিট, 45 মিনিট এবং 12 মিনিট ইত্যাদি এককসহ অখণ্ড সংখ্যাগুলির ল. সা. গু. প্রচলিত নিয়মে সহজেই পাওয়া যাবে।

$$\begin{array}{r|l} 4 & 40,\ 45,\ 12 \\ 5 & 10,\ 45,\ 3 \\ 3 & 2,\ 9,\ 3 \\ & 2,\ 3,\ 1 \end{array}$$

নির্ণেয় ল. সা. গু. $=4\times5\times3\times2\times3=360$ মিনিট বা $\frac{360}{60}=6$ ঘণ্টা। অর্থাৎ 6 ঘণ্টা পরে বাজনাগুলি আবার একত্র বেজে উঠবে। বলা বাহুল্য, একত্র বাজা প্রতি 6 ঘণ্টা অন্তর ঘটবে। পুনরায় 40, 45 এবং 12 সংখ্যা তিনটির কোন সাধারণ উৎপাদক নেই, তাই এই সংখ্যাগুলির গ. সা. গু. $=1$; অর্থাৎ $\frac{2}{3}$ ঘণ্টা, $\frac{3}{4}$ ঘণ্টা এবং $\frac{1}{5}$ ঘণ্টাগুলির গ. সা. গু $=1$ মিনিট $=\frac{1}{60}$ ঘণ্টা।

অখণ্ড সংখ্যার ক্ষেত্রে ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু-র যে সংজ্ঞা আছে, সেগুলিকে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হলে ভগ্নাংশের বিভাজ্যতা বলতে কি বোঝায় তা বলা প্রয়োজন।

ভগ্নাংশের বিভাজ্যতা—একটি ভগ্নাংশ $\frac{ক}{খ}$ অপর একটি ভগ্নাংশ $\frac{প}{ফ}$ দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি $\frac{ক}{খ}\div\frac{প}{ফ}$ বা $\frac{ক\times ফ}{খ\times প}$ একটি অখণ্ড সংখ্যা হয়।

ল. সা. গু-এর (সার্বিক) সংজ্ঞা—এটি এমন একটি ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সংখ্যা (ভগ্নাংশ বা অখণ্ড) যা প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যা (ভগ্নাংশ বা অখণ্ড) দ্বারা বিভাজ্য হবে।

গ. সা. গু.-এর (সার্বিক) সংজ্ঞা—এটি এমন একটি বৃহত্তম ধনাত্মক সংখ্যা (ভগ্নাংশ বা অখণ্ড) যেটির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যা (ভগ্নাংশ বা অখণ্ড) বিভাজ্য হবে।

উপরোক্ত সমস্যাটিতে নির্নীত ল. সা. গু. 6 ঘণ্টা এবং গ.সা গু. $\frac{1}{60}$ ঘণ্টা প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারী কিনা তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। উক্ত সমস্যায় ভগ্নাংশগুলির একক ঘণ্টা থাকার ফলে ভগ্নাংশগুলিকে অখণ্ড মিনিটে রূপান্তরিত করা সহজ হয়েছে। ভগ্নাংশগুলি যদি কোনো একক বিশিষ্ট না হত তাহলে পরস্পর বিশেষ সম্পর্কযুক্ত দুটি কাল্পনিক এককের মাধ্যমে ভগ্নাংশগুলিকে অখণ্ড সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হত। এই অখণ্ড সংখ্যাগুলির ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু. সাধারণ নিয়মে নির্ণয় করে এবং পুরাতন এককে পরিবর্তিত করে একক বর্জন করলেই ভগ্নাংশগুলির ঈপ্সিত ল. সা. গু এবং গ. সা. গু পাওয়া যেত। মোট কথা, প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলিকে অখণ্ড সংখ্যায় পরিবর্তন করা দরকার—এর জন্য ভগ্নাংশগুলির হর সমূহের ল. সা. গু বা ল. সা. গু-র কোন গুণিতক দ্বারা ভগ্নাংশগুলিকে গুণ করলে প্রতিটি ভগ্নাংশ অখণ্ড সংখ্যায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এখন প্রাপ্ত অখণ্ড সংখ্যাগুলির ল. সা. গু এবং গ. সা. গু-কে উক্ত গুণিতক দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশগুলির ঈপ্সিত ল. সা. গু এবং গ. সা. গু পাওয়া যাবে। পদ্ধতিটি সূত্রাকারে পরিবেশিত হচ্ছে।

সূত্র 1. $\frac{ক}{চ}$, $\frac{খ}{ছ}$, $\frac{গ}{জ}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশ সমূহের ল. সা. গু. $=\left(\frac{ক}{চ}\times ল, \frac{খ}{ছ}\times ল, \frac{গ}{জ}\times ল\right.$ ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যাগুলির ল. সা গু.$\left.\right)\div ল$,

যেখানে ল $=$ চ, ছ, জ ইত্যাদি হর সমূহের ল. সা. গু।

সূত্র 2. $\frac{ক}{চ}$, $\frac{খ}{ছ}$, $\frac{গ}{জ}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশ সমূহের গ. সা. গু. $=\left(\frac{ক}{চ}\times ল, \frac{খ}{ছ}\times ল, \frac{গ}{জ}\times ল\right.$ ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যাগুলির গ. সা. গু$\left.\right)\div ল$,

[শেষাংশ 18 পৃষ্ঠায়]

দানবদের রাজা

ফিলিপ জোস ফার্মার

ভাবানুবাদ: প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

এক জীববিজ্ঞানী বিশিষ্ট অতিথিকে চিড়িয়াখানা আর রসায়নাগার ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন।

তিনি বললেন "আমাদের বাজেট এত কম যে পরিচিত সব বিলুপ্ত প্রাণীকেই নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সেইজন্যে আমরা শুধু উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের সৃষ্টি করে থাকি —যারা সুন্দর ছিল আর যাদের খেলার ছলে নষ্ট করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি পাশবিকতা আর নিষ্ঠুরতার ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করছি আমরা। আপনি হয়ত বলবেন মানুষ যখনই এক শ্রেণীর প্রাণীকে প্রাণীরাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে তখনই সে যেন বিধাতাকে আঘাত করেছে।"

তিনি থামলেন। তাঁরা পরিখা আর মাঠের দিকে তাকালেন।

সামুদ্রিক ভোঁদড়টা জল থেকে তার মজার গোঁফটা বার করে রেখেছে। বাঁশের পেছন থেকে গরিলাটা উঁকি মারছে। পায়রার দল দেমাকি চালে হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটা গণ্ডার ছোটখাট যুদ্ধজাহাজের ভংগিতে দুলকি চালে চলেছে। নিরীহ চোখে একটা জিরাফ তাঁদের দিকে তাকাল। তারপর আবার পাতাটাতা খেতে শুরু করল।

"ঐ যে ডোডো নামের পাখিটা—ওটা দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই কিন্তু ভারী মজার। আর ওরা বড় অসহায়। আসুন—আমি আপনাকে নতুন সৃষ্টির ব্যাপারটা দেখাই।"

সেই বিরাট অট্টালিকার ভেতরে তাঁরা সারি সারি লম্বা-চওড়া চৌবাচ্চার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁরা জানলা আর ভেতরকার জেলির মধ্যে দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন।

জীববিজ্ঞানী বললেন, "ওগুলো হচ্ছে আফ্রিকার হাতির ভ্রূণ। আমরা বেশ বড় রকমের এক পাল হাতি তৈরি করে তাদেরকে সরকারের নতুন সংরক্ষিত এলাকায় ছেড়ে দেব বলে ঠিক করেছি।"

বিশিষ্ট আগন্তুকটি বললেন, "আপনার ভেতরে আনন্দের আভাস পাচ্ছি। আপনি সত্যিই প্রাণীদের ভালবাসেন—তাই না?"

ঃ "আমি জীবনকে ভালবাসি।"

আগন্তুক বললেন, আপনি কোথা থেকে নতুন করে সৃষ্টি করার জন্যে ডাটা পান?"

"প্রধানত পুরনো যাদুঘরে রাখা কঙ্কাল আর চামড়া থেকে। যেসব বই আর ফিল্ম মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা গেছে তাদের অনুবাদ করেও কিছু ডাটা পেয়েছি। ওহো, ঐ প্রকাণ্ড ডিমগুলো দেখছেন? রাক্ষুসে মোয়ার ছানারা বড় হচ্ছে। আর চৌবাচ্চায় যেগুলো দেখছেন এক্কেবারে তৈরি হয়ে গেছে সেগুলো বাঘের বাচ্চা। এগুলো বড় হলে ভয়ঙ্কর হবে কিন্তু ওদের সংরক্ষিত এলাকায় রাখা হবে।"

আগন্তুক চৌবাচ্চাগুলোর মধ্যে শেষের চৌবাচ্চার সামনে এসে থামলেন। বললেন, "কেবলমাত্র একটাই যে? এটা কি?"

জীববিজ্ঞানী এখন বিষণ্ণ গলায় বললেন, "আহা বেচারা এটা একেবারে একলা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি আমার সব ভালবাসা একেই দিয়ে যাব।"

আগন্তুক বললেন, "এটা কি এত বিপজ্জনক, হাতি বাঘ আর ভাল্লুকের চেয়েও মারাত্মক?"

জীববিজ্ঞানী উত্তর দিলেন, "এর জন্মের জন্যে আমাকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছিল।" তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপল।

আগন্তুক চৌবাচ্চার পাশ থেকে দ্রুত সরে এলেন। বললেন, "তাহলে এটা নিশ্চয়ই ..কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সেই দুঃসাহস করবেন না।"

জীববিজ্ঞানী মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ, এটা একটা মানুষ।"

21/12 নিউটন এভিনু দুর্গাপুর—713205

বৃত্ত---একটি নতুন ধর্ম

দেবাশীষ গোস্বামী

অঙ্ক, বিশেষতঃ জ্যামিতি আমার অতিপ্রিয় বিষয়। একদিন বৃত্তসংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে হল, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, জ্যা ও পরিধিস্থ কোণ সম্পর্কে এমন একটি ধর্মের সন্ধানলাভ করেছি, যার সম্বন্ধে কোন আলোচনা ইতোপূর্বে কোথাও চোখে পড়েনি। উচ্চশ্রেণীর কয়েকটি গণিত পুস্তকে খুঁজেও এবিষয়ে কোন আলোকপাত দেখতে পেলাম না, এমনকি আমার গৃহ-গণিতশিক্ষকের কাছেও এরূপ কোন ধর্ম পূর্বপরিচিত নয় বলে তিনি জানালেন। এসব কারণে ধর্মটি 'কিশোর-জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর পাঠকদের গোচরে আনতে আমি আগ্রহী। নিচে দুটি সূত্রের আকারে ধর্মটি উপস্থাপিত এবং প্রমাণিত হল ঃ—

প্রথম সূত্র ঃ

যদি R এবং C যথাক্রমে কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও কোন একটি জ্যা এর দৈর্ঘ্যকে সূচিত করে এবং যদি A দ্বারা ঐ জ্যা দ্বারা ছিন্ন উপচাপ কর্তৃক উৎপন্ন পরিধিস্থ কোণের মান বোঝানো হয়, তবে A ধ্রুবক হলে, $R \propto C$

প্রমাণ ঃ

মনে করি, O_1 কেন্দ্রীয় বৃত্তের (ব্যাসার্ধ R_1) একটি জ্যা X_1Y_1-এর দৈর্ঘ্য C_1 এবং O_2 কেন্দ্রীয় অপর একটি বৃত্তের (ব্যাসার্ধ R_2) একটি জ্যা X_2Y_2-এর দৈর্ঘ্য C_2। ধরি, X_1Y_1 ও X_2Y_2 উভয় জ্যা দ্বারা ধৃত পরিধিস্থ কোণের মান নির্দিষ্ট, অর্থাৎ A এক্ষেত্রে স্থির। প্রমাণ করতে হবে, $\frac{R_1}{R_2}=\frac{C_1}{C_2}$

X_1O_1, Y_1O_1, X_2O_2, Y_2O_2 যুক্ত করা হল। এবার মনে করি, X_1Y_1 ও X_2Y_2 দ্বারা ছিন্ন উপচাপদ্বয় কর্তৃক স্ব-স্ব বৃত্তের পরিধিতে উৎপন্ন কোণদ্বয় যথাক্রমে $\angle X_1Z_1Y_1$ ও $\angle X_2Z_2Y_2$ [চিত্র—1 দ্রষ্টব্য]। শর্তানুসারে, $\angle X_1Z_1Y_1 = X_2Z_2Y_2 = A =$ ধ্রুবক, এবার, $\angle X_1O_1Y_1 = 2\angle X_1Z_1Y_1$ [$\angle X_1O_1Y_1$ ও $\angle X_1Z_1Y_1$, X_1Y_1-এর উপর যথাক্রমে কেন্দ্রস্থ ও পরিধিস্থ কোণ।]

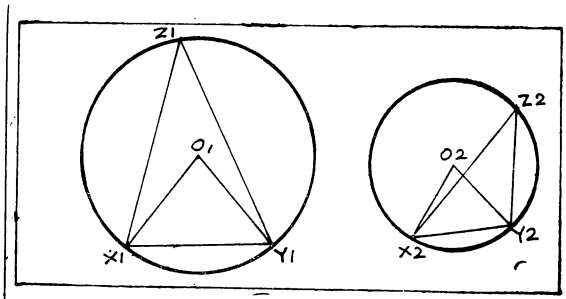

চিত্র—1

পুনরায়, $\angle X_2O_2Y_2 = 2\angle X_2Z_2Y_2$ [$\because \angle X_2O_2Y_2$ ও $\angle X_2Z_2Y_2$, X_2Y_2 এর উপর যথাক্রমে কেন্দ্রস্থ ও পরিধিস্থ কোণ।]

কিন্তু, $\angle X_1Z_1Y_1 = \angle X_2Z_2Y_2 =$ ধ্রুবক হওয়ায় $2\angle X_1Z_1Y_1 = 2\angle X_2Z_2Y_2 =$ ধ্রুবক, অর্থাৎ $\angle X_1O_1Y_1 = \angle X_2O_2Y_2 =$ ধ্রুবক।

আবার, $\angle O_1X_1Y_1 = \angle O_1Y_1X_1$ [$\because O_1X_1 = O_1Y_1$, কারণ উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ।]

$= \frac{1}{2}(180° - \angle X_1O_1Y_1)$...(i)

$\angle O_2X_2Y_2 = \angle O_2Y_2X_2$ [$\because O_2X_2 = O_2Y_2$, কারণ উভয়েই একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ।]

$= \frac{1}{2}(180° - \angle X_2O_2Y_2)$

$= \frac{1}{2}(180° - \angle X_1O_1Y_1)$....(ii)

[$\because \angle X_1O_1Y_1 = \angle X_2O_2Y_2$, পূর্বে প্রমাণিত]।

(*i*) ও (*ii*) থেকে, $\angle O_1X_1Y_1 = \angle O_1Y_1X_1 = \angle O_2X_2Y_2 = \angle O_2Y_2X_2$

পুনরায়, $\triangle X_1O_1Y_1$ এবং $\triangle X_2O_2Y_2$ এর মধ্যে, $\angle X_1O_1Y_1 = \angle X_2O_2Y_2$, $\angle O_1X_1Y_1 = O_2X_2Y_2$, $\angle O_1Y_1X_1 \angle O_2Y_2X_2$

$\therefore$ ত্রিভুজদ্বয় সদৃশকোণী, $\therefore$ সদৃশ।

$\therefore$ তাদের দুজোড়া অনুরূপ বাহু O_1X_1 ও O_2X_2 এবং X_1Y_1 ও X_2Y_2, $\therefore \frac{O_1X_1}{O_2X_2}=\frac{X_1Y_1}{X_2Y_2}$

বা, $\frac{R_1}{R_2}=\frac{C_1}{C_2}$ [$\because O_1X_1 = O_1$ কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= R_1$, $O_2X_2 = O_2$

কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= R_2$, $X_1Y_1 = C_1$ ও $X_2Y_2 = C_2$

$\therefore$ $R \propto C$ (A স্থির) —এটি প্রমাণিত হল।

এবার $\frac{R}{C}$ এই ধ্রুবকটির মান দ্বিতীয় সূত্রে স্থিরীকৃত হবে।

R, C ও A এই প্রতীকগুলি পূর্বের ন্যায় অর্থে ব্যবহৃত হলে, $\frac{R}{C} = \frac{1}{2}$ Cosec A

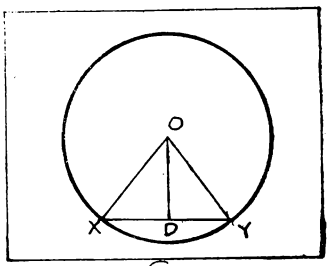

চিত্র-II

ধরা যাক, চিত্র II এর O কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ R এবং ঐ বৃত্তের কোন জ্যা XY এর দৈর্ঘ্য C OX এবং OY যুক্ত করে XY এর উপর D বিন্দুতে OD লম্বা টানা হল।

স্পষ্টতঃ অঙ্কনানুসারে, ODLXY বলে, $\triangle OXD$ ও $\triangle OYD$ উভয়েই সমকোণী ত্রিভুজ হবে এবং ঐ ত্রিভুজদ্বয়ের অতিভুজ OX = অতিভুজ OY (একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ) এবং OD সাধারণ বাহু হওয়াতে, ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হবে।

$\therefore$ $\angle XOD = \angle YOD = \frac{1}{2}\angle XOD$ এবং $XD = YD = \frac{1}{2}XY\frac{1}{2}C$ কিন্তু $\angle XOY$, XY কর্তৃক উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন $\therefore$ যদি XY জ্যা কর্তৃক উৎপন্ন পরিধিস্থ কোণের মান A হয় তবে $A = \frac{1}{2}\angle XOY = \angle XOD$ হবে। [$\therefore \angle XOD = \frac{1}{2}XOY$] পুনরায়, $\triangle OXD$ এই সমকোণী ত্রিভুজের $\angle XOD$ সাপেক্ষে OX ও XD যথাক্রমে অতিভুজ ও লম্ব বলে,

$$\frac{OX}{XD} = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}} = \text{Cosec} \angle XOD = \text{Cosec A}$$

$$\therefore \frac{R}{C\frac{1}{2}} = \text{Cosec A} \quad [\ \therefore OX = \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = R$$

এবং] $XD = \frac{1}{2}C$

বা, $\frac{R}{C} = \frac{1}{2}$ Cosec A [প্রমাণিত]

বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় সূত্রেরই পরিবর্তিত রূপ প্রথম সূত্র।

এই সূত্রদ্বয়ের বিশেষতঃ দ্বিতীয়টির প্রয়োগ করে পরিব্যাসার্ধ, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি সহজে নির্ণয় করা যায়। R, C ও A এর মধ্যে যেকোন দুটির মান জানা থাকলে এর সাহায্যে অপরটি মান নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন, 10cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের যে জ্যা দ্বারা ছিন্ন উপচাপ পরিধিতে 30° কোণ উৎপন্ন করে তার দৈর্ঘ্য $= C = \frac{R}{\frac{1}{2}\text{CosecA}}$

$$= \frac{10\text{cm}}{\frac{1}{2}\text{XCosec30}} = \frac{10\text{cm}}{\frac{1}{2}\times 2} = 10\text{cm}$$

4/1, Buiral Ground Road, Barasat, North 24 Parganas Pin-743201

[15 পৃষ্ঠার পর]

যেখানে ল = চ, ছ, জ ইত্যাদি হর সমূহের ল সা. গু।

উদাহরণ $\frac{2}{3}$, $1\frac{3}{5}$, $\frac{8}{9}$ ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু এবং গ. সা. গু নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলির হর সমূহ 3, 5 এবং 9 প্রভৃতির ল. স. গু = 45 ; প্রতিটি ভগ্নাংশকে হরগুলির ল. সা গু 45 দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যাবে 30, 72 এবং 40 —এই অখণ্ড সংখ্যাগুলির ল. সা. গু = 360 এবং গ. সা. গু = 2 (প্রচলিত নিয়মে)

$\therefore$ নির্ণয়ে ল. সা. গু $= \frac{360}{45} = 8$

এবং নির্ণেয় গ. সা. গু $= \frac{2}{45}$

এই অঙ্কটির সংখ্যাগুলির একটা কাল্পনিক একক 'ঘণ্টা' ধরে নিয়ে, 45 'মিনিট' = 1 'ঘণ্টা' এই কাল্পনিক সম্পর্কের আর একটি কাল্পনিক একক 'মিনিট' ধরে নিবন্ধের শুরুতে যে ভাবে $\frac{2}{3}$ ঘণ্টা, $\frac{3}{4}$ ঘণ্টা এবং $\frac{1}{5}$ ঘণ্টার ল. সা. গু এবং গ. সা. গু নির্ণয় করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে কাল্পনিক একক আরোপিত ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু এবং গ. সা. গু. নির্ণয় করে পরিশেষে কাল্পনিক একক 'ঘণ্টা' বর্জন করলেই ঈপ্সিত ল. সা. গু এবং গ. সা. গু পাওয়া যেত।

পাটীগণিতে ভগ্নাংশের ল. সা. গু এবং গ. সা. গু নির্ণয়ের জন্য একটি ভিন্ন পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতে ভগ্নাংশগুলির লবের এবং হরের ল. সা. গু এবং গ. সা. গু-র মাধ্যমে ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু এবং গ. সা. গু নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতি সম্পর্কে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো এক পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।

28/4/2/1B শ্রীমোহন লেন, কলি-26

চায়ের সঙ্গে চা-সেবীদের নাড়ীর যোগ। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চা-পায়ীদের এক কাপ গরম চা না পেলে সকালটা কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে মনে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক অথচ চা-পান করেন না, এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। সামনের কনকনে ঠাণ্ডার দিনগুলোতে চা চা-পায়ীদের কাছে অনেকটাই আরামদায়ক হবে। এই চা কবে কোথায় প্রথম মানুষের নজরে আসে তার প্রামান্য কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও—এ প্রসঙ্গে দুটো সুন্দর জনশ্রুতির কথা চুপিচুপি তোমাদের বলছি।

শোনা যায় খ্রীস্টীয় পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বোধিধর্ম নামে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চীনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে প্রার্থনা ধ্যান ইত্যাদি বিষয়েই সময় অতিবাহিত করতেন। একদিন তিনি যখন তন্দ্রাভিভূত হয়ে ধ্যান করছিলেন তখন তাঁর চোখের পাতাদুটো হঠাৎ ওঠানামা করতে শুরু করে। এতে তাঁর ধ্যানে বিঘ্ন হয়। তখন তিনি চোখের পাতাদুটোকে কেটে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেইখানেই কালক্রমে কিছু পাতাসহ একটা গাছ গজিয়ে উঠলো।এই গাছের পাতা বোধিধর্ম তুলে চিবাবার পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে পাতাগুলো তাঁকে শুধু সতেজ ও তৃপ্ত করেই তুললো না, তাঁর চোখের পাতাদ্বয়কেও পুণর্জীবিত করলো। বোধিধর্ম তখন তাঁর অনুগামীদের এই পাতার বিস্ময়করগুণের কথা বলতে চা-এর জনপ্রিয়তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আর দ্বিতীয় যে কাহিনী প্রচলিত আছে—তাতে বলা হয়েছে যে চা খাওয়া, থুড়ি পান করা নাকি প্রথম শুরু করেন জনৈক চীনা সম্রাট নান চেন্ নাঙ—সময়টা খ্রীস্টের জন্মের প্রায় 2737 বছর আগেকার। এই সম্রাট মহোদয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং ওষুধ পত্তরের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। একদিন তিনি পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে ফোটাচ্ছিলেন জীবাণুমুক্ত করবার জন্য। হঠাৎই নিকটে জন্মান একটি চা গাছের কিছু পাতা ঐ গরম জলের পাত্রে পড়ে যায় এবং ফুটতে শুরু করে। নতুন এই পানীয় পান করে সম্রাট খুশী হন এবং সাম্রাজ্যের দিকে দিকে এই পানীয়ের জনপ্রিয়তা প্রচার করেন। এই ভাবেই নাকি চায়ের চল শুরু হয়।

দুটো পাতা একটা কুঁড়ি—এই রকম পাতা গাছের একেবারে ওপরের দিক থেকে সংগ্রহ করা হয়। চা গাছ সাধারণত সাড়ে তিন থেকে চার ফুট এবং কখনও কখনও সাড়ে চার ফুট পর্যন্তও লম্বা হয়। এরা জন্মায় এমন জায়গায় যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হবে কিন্তু জল জমবে না। সুতরাং এই শর্ত পূরণ করতে পারে একমাত্র পাহাড়ের ঢাল। তাই পাহাড়ের ঢালই চা গাছের স্থায়ী ঠিকানা। আমাদের যেমন ভাল নাম, ডাক নাম আছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পরিভাষায় চায়ের এই ভাল নামটি কি জান?—ক্যামেলিয়া সাইনেন্‌সিস্।

এক নিশ্বাসে পাঁচটা দেশের নাম করা যায় যারা দুনিয়ার মোট উৎপন্ন চায়ের সিংহ ভাগই সরবরাহ করে। দেশগুলো হলো—ভারত, চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। জান কি ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে না, সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানিও করে। ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের প্রায় সবটাই উৎপাদন করে পূর্ব ভারতের তিনটি রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের তিনটি রাজ্য। একটা খবর তোমাদের চুপিচুপি জানিয়ে দিই—ইংরেজদের অনেক আগেই কিন্তু আমরা, ভারতীয়রা চা সেবন রপ্ত করি। পৃথিবীতে প্রথম বিজ্ঞান সম্মত ভাবে চা-চাষ শুরু করে জাপান। সময়টা ত্রয়োদশ শতাব্দী। জাপানে তো আবার শুধুমাত্র এই চাকেই কেন্দ্র করে প্রতি বছর এক বিরাট জনপ্রিয় উৎসব পালিত হয়।

দুনিয়ার চা-পায়ীরা কতরকম ভাবে চা পান করেন জান? পারলে না তো,—চার রকম ভাবে। ব্ল্যাক টি, গ্রীন টি, ব্রীক টি এবং উলং টি। ব্ল্যাকটি তো আমরাই সচরাচর পান করে থাকি, তবে দুধ মিশিয়ে হোয়াইট টি করে। আর গ্রীনটির চল বেশি ইউরোপীয়ানদের মধ্যেই। গ্রীনটি তৈরি করে যখন পান করার জন্য পরিবেশন করা হয় তখন এর রঙ থাকে গ্রীন অর্থাৎ সবুজ। ব্রীকটির কট্টর সমর্থক হলেন তিব্বতীরা। নাম থেকেই এই চায়ের খানিকটা পরিচয়

পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চায়ের পাতাগুলোকে চাপ দিয়ে দিয়ে শক্ত ইটের মতো আকৃতি দেওয়া হয়। তিব্বতীরা এই ইটের মতো দেখতে চা কেটে কেটে পরিমাণ মতো দুধ, চিনি মিশিয়ে পান করেন। উলংটি আর কিছুই নয়, সাধারণ চায়ের পাতার সঙ্গে ফুলের পাপড়ি ইত্যাদি মিশিয়ে সুগন্ধ করা হয়। ফরমোজা দ্বীপে এই চায়ের খুব প্রচলন আছে।

এবার চায়ের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করে লেখা শেষ করছি। চায়ের পাতায় প্রধানত যে দু রকমের রাসায়নিক পদার্থ আছে তার একটি হল ট্যানিন্। এটি আছে তেরো থেকে আঠারো শতাংশ। দ্বিতীয় পদার্থটি হল দুই থেকে পাঁচ শতাংশ থেইন্। আর আছে কিছু পরিমাণ উদ্বায়ী তেল। অতিরিক্ত চা-পান করলে শরীর খারাপ হয়ে পড়ে— কেন জান? যত নষ্টের গোড়া ঐ থেইন নামের পদার্থটি। এই থেইন্ই দ্রবীভূত অবস্থায় আমাদের পাকস্থলীতে গিয়ে যত বিপত্তি ঘটায়। খুব খাটাখাটুনীর পর এক কাপ চা পান করলে বেশ স্বস্তি লাগে—এটা হয় কিন্তু প্রধানত ট্যানিনের গুণে। ট্যানিন ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

নন মহারাজা নন্দ কুমার, রোড (নর্থ) কলকাতা-35।

কার্টুন: রেবতীভূষণ

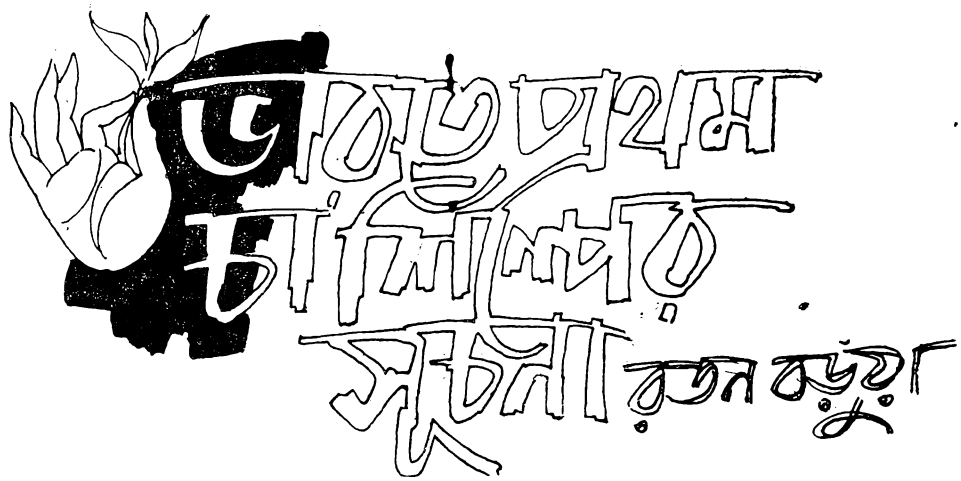

রতন বড়ুয়া

1834 সনে ক্যাপ্টেন জেনকিন্স আসামের কমিশনার হয়ে আসেন। ইতিপূর্বে 1832-33 সনে লর্ড উই-লিয়াম বেণ্টিঙ্কের আদেশে তিনি আসামে এসেছিলেন উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয়ে অনুসন্ধান করতে এবং তখনই তিনি এদেশে চা-গাছের কথা ও চা-এর সম্ভাবনার কথা জানতে পারেন। ফলে ক্ষমতায় বসে জেনকিন্স সাহেবের প্রচেষ্টাতেই সরকারী তত্ত্বাবধানে আসামে প্রথম চা-বাগান খোলা হয়।

তবে আসামে চা-গাছের প্রথম নমুনা পাওয়া যায় 1823 সনে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন এজেন্ট মেজর রবার্ট ব্রুস সিংফোদের দেশে (অধুনা অরুণাচল প্রদেশের অংশ) গিয়ে 1823 সনে চা-গাছের সন্ধান পান। 1824 সনে কর্নেল সার্জন, রবার্ট ব্রুসের ভাই সি. এ. ব্রুস, নাউশিল, কার ক্যাপ্টেন, চার্লটন, বিরিসফিন, বলোরাম খগীয়া ফুকন এবং মণিরাম দুয়ারা প্রমুখ পুনরায় সিংফোদের দেশে যান। সেখানে শদিয়াতে থেকে সি. এ. ব্রুস ও চার্লটন চা-গাছের নমুনাসংগ্রহে অনুসন্ধান চালিয়ে বহু চ-গাছের সন্ধান পান। তখন নমুনা স্বরূপ কিছু চা-গাছ এনে তৎকালীন কমিশনার ডেভিড স্কটকে দেওয়া হয়। ডেভিড স্কট সেই চা-গাছের নমুনাগুলো পরীক্ষার জন্যে কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেণ্ডেন্টের নিকট পাঠান। সেখানে পরীক্ষা করে মতামত দেওয়া হয় যে, যদিও সেইগুলো চীনের চা-গাছেরই বংশ, তথাপি চীনের চা-ই আসল এবং উৎকৃষ্ট। ফলে পরবর্তী কমিশনাররাও আর এ ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেনি এবং 1824 সন থেকে 1832 সন পর্যন্ত চা-গাছের ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না।

1832 সনে জেনকিন্স সাহেব আসামে এসে বহু অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেন যে আসামের চা-গাছ এবং চীনদেশের চা-গাছ দুইই একই বংশজাত এবং প্রায় একই, এবং এই পাতা থেকেই বাণিজ্যোপযোগী চা তৈয়ার হতে পারে। জেনকিন্স সাহেবের তথ্যের উপর নির্ভর করে, আসামের মাটি এবং জলবায়ু চা-গাছের নিমিত্ত উপযোগী কিনা পরীক্ষা করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে একটি চা-কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাঃ ওয়ালিশ, ইংরেজ ব্যবসায়ী ডাঃ মেকলেণ্ড, ডাঃ গ্রিফিথ এবং উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ বাবু রামকমল সেন ও গর্ডন সাহেব। এই কমিটি গর্ডন সাহেবকে চীনদেশ থেকে চা-গাছ ও কাজ জানা চীনা শ্রমিক আনার জন্য পাঠায়।

চীনদেশ থেকে কুড়ি হাজার চা-গাছের চারা এবং কিছু চায়ের কাজ জানা চীনা মানুষ নিয়ে গর্ডন সাহেব ফিরে আসেন 1834 সনে এবং সাথে সাথেই সরকারী তত্ত্বাবধানে আসামে প্রথম চা-বাগান তৈরির কাজ শুরু হয়। তাছাড়া তখন কমিশনার হয়ে এসেছেন জেনকিন্স সাহেব নিজেই। ফলে মূলতঃ তাঁরই উৎসাহে ব্রুশ সাহেবকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট করে ব্রহ্মপুত্র এবং কুণ্ডিল নদীর মিলনস্থলের পাড়ে একটি ছোট চা-বাগান খোলা হয়। প্রথম যে স্থানে সরকার চা রোপন করে সেই স্থানের নাম হয়ে যায় (চাহ-বোয়া) বা চাবুয়া। অসমীয়া ভাষায় বোয়া শব্দের অর্থ 'রোপণ'।

যদিও যে কোন কারণেই হোক সরকারের এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি, একটিও চা-গাছ বাঁচেনি। পরে আসামেরই জয়পুর অঞ্চলে নতুন চা-বাগান খোলা হয়। এই বাগান থেকেই ব্রুস সাহেব 1837 সনে 46 বাক্স চা কলকাতায় পাঠায়। সেখান থেকে কিছু নমুনা পাঠানো হয় বিলেতে এবং সেখানে পরীক্ষা করে জানানো হয় যে আর একটু যত্ন

এবং সাবধান হয়ে তৈয়ার করলেই আসামের চা চীনের চা-গাছের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হতে পারবে।

ফলে চা-ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসারের জন্য 1839 সনের 1লা জুন 'আসাম কোম্পানি' নামে একটি কোম্পানি খোলা হয়। কোম্পানির মূল কার্য্যালয় থাকে কলকাতায় এবং এই কোম্পানি পরিচালনার জন্য একটি সমিতি বা ডাইরেক্টর বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে —I. টি ডিকেনস, 2. জে. পেটোল 3. দ্বারকনাথ ঠাকুর 4. ডব্লিউ প্রিন্সেস. 5. জে বিচার 6. জি. রেমফ্রি 7. জি. কলহাম 8. এ. ডি. এস. লার্পেন্ট 9. এইচ হলরইড 10. মতিলাল শীল 11. প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। এই কোম্পানি 5 লক্ষ পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহ করে নতুন নতুন বাগান খোলা এবং বুড়িডিহং ও টিংরাই নদীর পারে 'ফেক্টরি' খুলে প্রথম চা-শিল্পের সম্প্রসারণ শুরু করে। সরকারও 1840 সনে জয়পুরের চা-বাগানটি 'আসাম কোম্পানি'-র নিকট বিক্রি করে দেয় এবং আসাম কোম্পানি'র কার্যাবলীর সাথে সরকারের যোগাযোগ রক্ষার জন্য সরকার পক্ষ থেকে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করে দেওয়া হয়।

তবে আসাম তথা ভারতবর্ষে চা-শিল্পের-জনকস্বরূপ ব্রুস সাহেবেরা দুই ভাই যথাক্রমে রবার্ট ব্রুস এবং সি. এ. ব্রুস ও জেনকিন্স সাহেবের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Digboi, Assam,

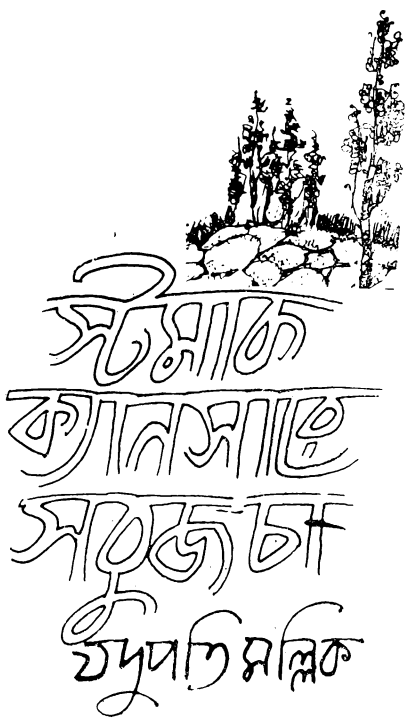

পৃথিবীর মধ্যে জাপানের 'শিজুওকা প্রেফেকচার' অঞ্চলের স্টমাক ক্যানসারের রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। এই অঞ্চলের খুব কম মানুষই স্টমাক ক্যানসারে আক্রান্ত হন। গবেষণা করে জানা গেছে এর কারণ এখানকার মানুষের 'সবুজ চা' পান।

আমরা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে চা খেয়ে থাকি তা তৈরি হয় চা গাছের পাতা থেকে। এই চা 'সবুজ চা' নয়। সবুজ চা তৈরি হয়ে থাকে চা গাছের কাণ্ডকে শুকনো করে গুঁড়িয়ে। জাপানের 'শিজুওকা প্রেফেকচার' অঞ্চলের অধিবাসীরা এই চা-ই খায়।

গবেষণায় আরো জানা গেছে, এই 'সবুজ চা'-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রোটিন নিয়মিত আহার করলে স্টমাক ক্যানসার রোধ হবে।

রামেশ্বরপুর, হুগলি,

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

কী বরাত আমার! তা, হেঁট হয়ে কি খুঁজছিস অমন করে?
না — মানে যার জন্য তোমার কাছে যাচ্ছিলুম আর কি —
— মানে, বিজয়ার প্রণাম দেখা যখন হয়েই গেল —
তুম সব ক্ষমা করে দিলুম! ভেবেছিলুম বেশী বুঝে ফেলে আমাদের পুরোনো ঐতিহ্যগুলো ভুলে মেরে দিয়েছিস।
এখন চল আমার সঙ্গে, মিষ্টিমুখ করবি।
আহা, মিষ্টি!
মিষ্টিমুখ, ভাল কথা। তা-জিনিসগুলো মেজকার গবেষণাগারে তৈরী নয়তো!
সেই সঙ্গে কল-কব্জার কিছু কেরামতিও দেখাবো। মানে বাড়ি সব অটোমেটিক সিসটেম্ করে ফেলেছি।
ঘরে আয়, এলেই বুঝতে পারবি।
আউচ্!
কি হলোরে?
কঁৎ
ও
চ্
উপস্, তোমাদের দরজাটা!
কি মুশকিল! গেছিস তো আটকে? আধুনিক টেকনোলজি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকলে এমনই হয়।
তোমার কেরামতি যে দরজার মধ্যে তা আমি জানবো কি করে?

বোকারাম! এখন যান্ত্রিক যুগ—কলকারখানা থেকে নিত্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র যন্ত্র, সব অটোমেটিক এই দরজাটাও ঐ সিসটেমেই তৈরী। এটা দেখালুম এক নম্বর।
মেজকা, আমি তোমার অটোমেটিক দরজাতে আটকে আছি! খুলে দাও!
ওঃহো, এর জন্য সুইচ্ আছে।
মুহূর্তে ওপেন! কেমন লাগল? সবই টেকনিক্যাল্ কারিগরি।
তোকে আরও কয়েকটা ছোট-খাট যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়ে দেব, আয়।
কি হলো, অমন ক্যবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বুঝেছি—না, এতে কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই।
অ!
আরিব্বাস!
এ ম্যাজিক নাকি? দরজা খুলতেই লাইট ফ্যান, সব আপনা থেকেই চালু হয়ে গেল!
ম্যাজিক কেন হবে? এ সব যন্ত্রেরই কলা-কৌশল। এটা হল এটা হল দু'নম্বর।
আর তিন নম্বর এই অটোমেটিক যন্ত্রটাকে তো তুই চিনিস।
ভ্যাকুয়াম্ ক্লিনার!

অটোমেটিক ঝাড়ুও বলতে পারিস। সুইচ্ টিপ্‌লেই -ইয়াং!
মেজকা ঠিক করে ধরো! তোমার জানালার পর্দা —
ঘ্যাং, নতুন পর্দাটা ফর্দাফাঁই হয়ে গেল!
ওঃ, আর একটু হলে পুরো পর্দাটাই সাফ্ করে দিত!
এটা এখন থাক। তোকে আর একটা জিনিস দেখাই, চল।
সেই ভাল।
বাঃ, এ যে দেখছি আধুনিক বাথরুম্!
এটাও স্বয়ংক্রিয়। চান করবি? জল রেডি। ঠাণ্ডা গরম উষ্ণ—সুইচ্ টিপলেই ঝর্ণা বয়ে যাবে দ্যাখ—
চার নম্বরেও ভুল করে ফেলেছো মেজকা! ওটা গরম জলের —
ইয়া!
ওরে বাবারে গেলুম্‌রে!
দাঁড়াও, আমি এখুনি ঠাণ্ডা জলের সুইচটা মেরে দিচ্ছি!
ব্লা-ব্লা-ব্লা-!
হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছিলে মেজকা, যন্ত্র সম্বন্ধে একটু সাধারণ জ্ঞান না থাকলে পদে পদে ফ্যাসাদ!
না বাবা, এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে আমরা নেই!

পড়াশোনা

উষ্ণতা ও তার পরিমাপ

সমীর কুমার ঘোষ

তাপ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু ধারণা আছে। তাপ এক ধরনের শক্তি যা গ্রহণ করে বস্তু গরম হয় এবং যা বর্জন করে বস্তু ঠাণ্ডা হয়। তাপের স্বরূপ সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে, তাপ এক ধরনের অদৃশ্য ভরহীন পদার্থ এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যালরিক (Caloric)। কিন্তু 1798 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী কাউন্ট রামফোর্ড-এই ধারণা পাল্টে দেন। ঘর্ষণের ফলেও যে তাপ উৎপন্ন হ'তে পারে, সেকথা তিনি প্রমাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, তাপকে বস্তুর ভিতরকার অণু বা পরমাণুর গতি-শক্তির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায় এবং তাপ সৃষ্টি করতে শক্তির প্রয়োজন হয়। এই কারণে তাপকে এক ধরণের শক্তি বলে গণ্য করা হয়। তাপ প্রয়োগ করার ফলে, বস্তুর নানারকম প্রাকৃতিক গুণাবলীর ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হ'তে পারে, বা বস্তুর দহন ও প্রাণনাশ বা বস্তু থেকে আলোর উৎপত্তি হ'তে পারে। সব বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু পরিমাণ তাপশক্তি থাকে এবং বস্তুর এই তাপীয় অবস্থা সূচীত হয় বস্তুর উষ্ণতা (temperature) দিয়ে। তাপ প্রয়োগে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে এবং সেজন্য বস্তুর তাপকে যদি 'কারণ' (Cause) বলে মনে করা হয় তাহলে উষ্ণতাকে তার 'ফল' (effect) বলে মনে করা যেতে পারে।

কোন বস্তুর উষ্ণতা মাপবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাকেই উষ্ণতামাপক যন্ত্র বা থার্মোমিটার (Thermometer) বলে। 1710 খ্রীস্টাব্দে Daniel Fahrenheit (1686-1736) নামে আমস্টার্ডামের এক ধনী বণিক প্রথম থার্মোমিটার তৈরি করেন। সমসাময়িক কালে 1711 খ্রীস্টাব্দে, সুইডেনের Elvius, 1740 খ্রীস্টাব্দে উপ্‌সালার Linneaus এবং 1741 খ্রীস্টাব্দে Andres Celsius ; থার্মোমিটার স্কেল পৃথক পৃথক ভাবে প্রবর্তন করেন। Celsius প্রবর্তিত স্কেলকে 'সেন্টিগ্রেড' বা 'সেলসিয়াস স্কেল', ফারেনহাইট প্রবর্তিত স্কেলকে 'ফারেনহাইট স্কেল' এবং ফরাসী বিজ্ঞানী Reaumur (1684-1757) প্রবর্তিত অধুনালুপ্ত স্কেলকে 'রেমার স্কেল' বলে! এই তিন ধরনের স্কেলের মূল পার্থক্য শুধু থার্মোমিটারে নিম্নস্থিরাঙ্ক (lower fixed point) ও ঊর্ধস্থিরাঙ্ক (upper fixed point) এর মধ্যে মধ্যবর্তী ভাগের সংখ্যার অভিন্নতা। এই তিনটি স্কেল ছাড়াও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গণনার কাজে আর এক ধরনের স্কেল প্রচলিত আছে, যার নাম 'চরম স্কেল' (Absolute scale)। এই সবকয়টি স্কেলেরই নিম্ন ও ঊর্ধস্থিরাঙ্কের মধ্যকার ব্যবধান (fundamental interval) সমান। শুধু এই ব্যবধানের মধ্যে বিভিন্ন মানের ভাগের ফলেই বিভিন্ন স্কেলের উৎপত্তি হয়েছে।

উষ্ণতার সঙ্গে পদার্থের যে সব ধর্মের নিয়মিত হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে, সেই সব ধর্মকে কাজে লাগিয়ে থার্মোমিটার যন্ত্রটি তৈরি করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ (ক) পদার্থের দৈর্ঘ্য বা আয়তন বৃদ্ধি ঃ—উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের দৈর্ঘ্য বা আয়তন বাড়ে। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে পারদ বা অ্যালকোহল থার্মোমিটার এবং গ্যাস থার্মোমিটার তৈরি করা হয়েছে। (খ) স্থির আয়তনে যেহেতু গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায় সেজন্য স্থির আয়তনে রাখা গ্যাসের চাপ, উষ্ণতা বাড়লে বাড়ে। বাষ্পচাপ থার্মোমিটারে (Vapour pressure thermometer) এই ধর্ম কাজে লাগানো হয়েছে। (গ) পরিবাহীর রোধ-এর (resistance) বৃদ্ধি ঃ উষ্ণতা বাড়লে সাধারণতঃ সব বস্তুর রোধ বৃদ্ধি পায়। প্ল্যাটিনাম রোধ থার্মোমিটারে (pt. resistance thermometer) এই ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে। (ঘ) দুইটি ভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলে উদ্ভূত তড়িৎচালক বলের (E.M.F.) পরিবর্তন : উষ্ণতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তড়িচ্চালক বলের পরিবর্তন ঘটে। তাপ তড়িৎ থার্মোমিটার (thermocouple) তৈরির কাজে এই ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। (ঙ) উষ্ণ ধাতব তারের বিকিরণ বর্ণালীর পরিবর্তন : উষ্ণতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত ধাতব তারের বিকিরণ বর্ণালীর (Radiation Spectra) পরিবর্তন ঘটে। এই ধর্মের সাহায্যে বিকিরণ থার্মোমিটার (Radiation Pyrometer) তৈরি করা হয়েছে।

এই বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার—যাদের কথা উল্লেখ করা হ'ল—তারা কিন্তু বস্তুর উষ্ণতা মাপার জন্য সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় না। প্রত্যেক থার্মোমিটারেরই একটা নিজস্ব পাল্লা (range) আছে, যার মধ্যেই শুধু সেই নির্দিষ্ট থার্মোমিটারকে ব্যবহার করা যায়। যেমন, তরল

থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে, পারদ থার্মোমিটার (39°C থেকে 300°C); অ্যালকোহল থার্মোমিটার (—130°C থেকে 75°C), হাইড্রোজেন গ্যাস থার্মোমিটার (—200°C থেকে 1100°C); নাইট্রোজেন গ্যাস থার্মোমিটার (—200°C থেকে 1500°C); প্ল্যাটিনাম রোধ থার্মোমিটার (—200°C থেকে 2100°C) পাইরোমিটার (অতি উচ্চ তাপমাত্রা—যেমন সৌরপৃষ্ঠের তাপমাত্রা 6000°C)। এই সব থার্মোমিটার ছাড়াও, সংপৃক্ত বাষ্প-চাপ, তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল বলে। ঐ চাপ থেকেও তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। এই ধরনের ব্যবস্থাকে 'বাষ্প-চাপ থার্মোমিটার। (Vapour pressure thermometer) বলে। এদের ব্যবহার এরকম। অক্সিজেন বাষ্প (150°C থেকে 210°C), নিয়ন বাষ্প (—246°C থেকে—250°C); হাইড্রোজেন বাষ্প (—253°C থেকে—262°C) এবং হিলিয়াম বাষ্প (—268°C থেকে—272°C)। আসলে এই ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহার শুধুমাত্র নিম্নতাপমাত্রা (low temperature) অঞ্চলেই সুবিধাজনক। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, যে কোনো উপায়েই হোক্ না কেন, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব বলে মনে করা হয় তার মান হ'ল শূন্য ডিগ্রী, চরম স্কেলে (—273°C)। এই তাপমাত্রায় পৌঁছানো কিন্তু খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অবশ্য এক বিশেষ উপায়ে, এই তাপমাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করেন।

এ সমস্ত ধরনের বিভিন্ন থার্মোমিটার ছাড়াও, এক বিশেষ পদ্ধতিতে 'প্রায়' চরম শূন্য ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভবপর বলে মনে করা হয়। ব্যাপারটা হ'ল, কোন চৌম্বক বস্তুর চৌম্বকনের ফলে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার তার বিচুম্বকনের ফলে, তাপমাত্রা হ্রাস পায়। রুদ্ধতাপ (adiabatic) অবস্থায় কোন বস্তুকে বিচুম্বকিত করে প্রায় চরম শূন্য পর্যন্ত তাপমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের থার্মোমিটারকে সেজন্য 'চৌম্বক থার্মোমিটার' বলা হয়।

এই হ'ল, মোটামুটি উষ্ণতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ছড়া

পরিবেশ দূষণ

কমল চক্রবর্তী

পরিবেশটি দূষণ হলে
দূষণ করো রোধ,
রোধের কাজে জাগে বুঝি
সকল লোকের বোধ।
বায়ুদূষণ শব্দ দূষণ
এ সব করো দূর,
আইন করে মানলে নিয়ম
জীবন হবে সুর

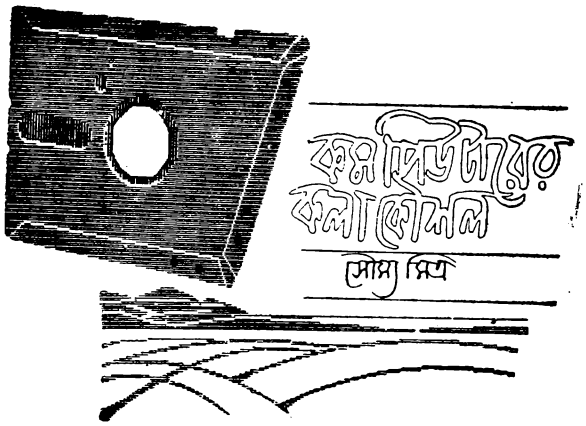

হার্ড ডিস্ক

ফ্লপির ম্যাগনেটিক ডিস্ক মিডিয়াতে যার সব থেকে বেশি প্রচলন, সেটি হল হার্ড ডিস্ক! নাম থেকেই বোঝা যায়। হার্ড ডিস্কের চাকতিগুলি ফ্লপির মত পাতলা আর নমনীয় নয়। এগুলি সবই হাল্কা অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ে তৈরী। ফ্লপি ডিস্কের চাকতির মতই হার্ড ডিস্কের চাকতির দুই পিঠে গামা ফেরিক অক্সাইডের প্রলেপ থাকে। তবে ফ্লপির সঙ্গে হার্ড ডিস্কের সব থেকে বড় তফাৎ হলো এখানে একটি ডিস্কের বদলে একাধিক ডিস্ক পর পর সাজিয়ে (Stack) একত্রিত ভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ডিস্কের নিজস্ব রিড্/রাইট হেড থাকে আর সেগুলি একই সঙ্গে অত-গুলি তথ্য লেখে বা পড়ে। ফ্লপির মতই হার্ড ডিস্কের চাকতি গুলিতে সমকেন্দ্রিক বলয়াকৃতি ট্র্যাকে তথ্য লেখা হয় আর সব কটি ডিস্কের প্রতিটি সমান্তরাল ট্র্যাককে এক-ত্রিত করে একটি সিলিণ্ডার (Cylinder) বলা হয়। এছাড়া হার্ড ডিস্কের চাকতিগুলি ফ্লপির চাকতির থেকে বহু গুণ জোরে ঘোরে। এতো জোরে ঘোরে যে ঘূর্ণায়মান চাকতির গায়ে লেগে থাকা বাতাসের স্তরের ধাক্কায় রিড্/রাইট হেড-গুলি চাকতির পিঠ থেকে কয়েক মাইক্রণ (Micron) উঁচুতে ভেসে থাকে। এ যেন ঠিক হোভারক্রাফট্ (Hov-ercraft) যানের মতো। হোভারক্রাফট যখন জল বা ডাঙার ওপর চলে তখন সে জল বা ডাঙা না ছুঁয়ে কয়েক ফুট বাতাসের গদির ওপর ভেসে থাকে। হার্ড ডিস্কের রিড্/রাইট হেড গুলিও ঘূরন্ত চাকতির গায়ে লেগে থাকা ঘূরন্ত বাতাসের গদির ওপর ভেসে থাকে। চাকতির সঙ্গে রিড্/রাইট হেডের কোনো রকম যান্ত্রিক সংযোগ না থাকার জন্য চাকতি বা হেডের কোনো রকম ক্ষয় হয় না। উপরন্তু অত্যন্ত জোরে ঘুরতে থাকা চাকতিতে খুব তাড়াতাড়ি তথ্য লেখা বা পড়া যায় তাই ফ্লপির থেকে হার্ড ডিস্কে বহু গুণ তাড়াতাড়ি তথ্য রিড্/রাইট্ করা যায়।

তবে হার্ড ডিস্কের ভাসমান (Flying Head) হেড প্রযুক্তি আবার বিশেষ সমস্যাও সৃষ্টি করে। চাকতি থেকে কয়েক মাইক্রণ দূরত্বে ভেসে থাকা হেড গুলি যদি কোনো ক্রমে একবার মিনিটে কয়েক হাজার পাক গতিতে ঘুরতে থাকা চাকতির গায়ে ঠেকে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঘষা লেগে চাকতির ফেরিক অক্সাইডের প্রলেপ কিম্বা রিড্/রাইট হেডটি বরাবরের জন্য খারাপ হয়ে যায়। সমস্যাটি বুঝতে আরো সুবিধে হবে যদি কয়েক মাইক্রণ দূরত্বটি কতটা জানা থাকে। এক মাইক্রণ হলো এক মিটারের দশ লাখ ভাগের এক ভাগ (10^{-6} Meter)। মাইক্রন এককে ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার সাইজ মাপা হয়। অর্থাৎ খালি চোখে মনে হবে হেডটি ঘূরন্ত চাকতির গায়ে ঠেকে রয়েছে। বস্তুত হেড ও চাকতির মাঝে ফাঁক এতই কম্ থাকে যে ওই ফাঁকের তুলনায় সিগা-রেটের ধোঁয়ার কার্বন কণাও বিরাট ফুটবলের সমান মনে হবে। তাই খোলা বাতাসে হার্ড ডিস্কের চাকতি ঘোরানো যায় না। পুরো হার্ড ডিস্ক যন্ত্রটি একটি সম্পূর্ণ ধূলিকণা মুক্ত বাতাসের পরিবেশে একটি বায়ু নিরুদ্ধ কেসে বন্ধ করা থাকে। হার্ড ডিস্কের বন্ধ কেসের বায়ু পৃথিবীর সব থেকে পরিষ্কার। অপারেশন থিয়েটারের বাতাসের থেকেও বেশি পরিষ্কার রাখা হয়! সুতরাং ফ্লপির মতো হার্ড ডিস্কের চাকতি ইচ্ছেমতো খুলে বদলানো যায় না বদলাতে হলে গোটা যন্ত্র বা বায়ু নিরুদ্ধ কেসে বন্ধ করা সবকটি চাকতি এবং রিড্/রাইট্ হেড অ্যাসেম্বলিং বদলাতে হয়। অবশ্য তার জন্য অসুবিধা নেই, কারণ কেউই ফ্লপির মত বারে বারে হার্ড ডিস্ক বদলান না। একটি হার্ড ডিস্কে 10, 20, 30 কিম্বা তারো বেশি মেগাবাইট তথ্য ধরে। তাই একটি হার্ড ডিস্কে অনায়াসে কম করে তিরিশটি থেকে শ'খানেকের থেকেও বেশি ফ্লপি তথ্য লিখে রাখা যায়। তবে এতো কাণ্ড করেও অনেক সময় হার্ড ডিস্কের প্রাণ বাঁচানো যায় না। ধরা যাক কেউ হার্ড ডিস্ক লাগানো কম্পিউটারে কাজ করতে করতে হঠাৎ টেবিল থেকে উঠতে গেল। সেই সময় অসাবধানে টেবিলে তার হাঁটুটা জোরে ঠুকে গেল। ব্যাস এক মুহূর্তের জন্য রিড্/রাইট হেডটা বাতাসের গতি ঠেলে ঘুরন্ত চাকতির গায়ে ঠেকে গিয়ে হাজার পনেরো টাকার হার্ড ডিস্ককে বরাবরের জন্য বরবাদ করে দিল! শুধু টাকাটাই গেল তাই নয়। তার থেকেও দামী, আর টাকা দিয়ে কখনই যাকে ফিরে পাওয়া যাবে না এমন কয়েক মেগাবাইট অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্য হয়তো একই সঙ্গে বরাবরের জন্য হারিয়ে গেল। এমন ঘটনা কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে মোটেই বিরল নয়। তাই যাঁরাই হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করেন, তাঁরা

সবাই হার্ড ডিস্কে লিখে রাখা যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম এবং তথ্যের ডুপ্লিকেট কপি ফ্লপিতে কিম্বা ম্যাগনেটিক কার্টিজ টেপে করে রাখেন। এই কাজকে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে বলা হয় ব্যাকআপ (Backup) করা।

কার্টিজ ব্যাকআপটেপ

ম্যাগনেটিক মিডিয়ার পরই জনপ্রিয়তার দিক থেকে ম্যাগনেটিক টেপ মিডিয়ার স্থান। ম্যাগনেটিক টেপে গান বা ভিডিও সিগন্যাল রেকর্ড করার মতই কম্পিউটারের তথ্য ও সংরক্ষণ করা হয়। এই কাজের জন্য বিভিন্ন রকম ম্যাগনেটিক টেপ ড্রাইভ যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়। পারশোনাল কম্পিউটার জগতে ম্যাগনেটিক টেপ মিডিয়া হিসেবে সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় কার্টিজ টেপ।

গান বাজানো ক্যাসেটের থেকেও ছোট আকারের প্লাস্টিক টেপ ড্রাইভ যন্ত্রে লাগিয়ে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা তথ্য ফিতেতে রেকর্ড করে রাখা যায়। পরে দরকার পড়লে ওই একই যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করা প্রোগ্রাম কম্পিউটারে লোড করে নেওয়া হয়।

সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাকশেস

কার্টিজ টেপ বা যে কোনো রকম ম্যাগনেটিক টেপ স্টোরেজেই কিন্তু একটা অসুবিধা থাকে। এই অসুবিধাটি হল টেপে রেকর্ড করা অজস্র প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে কোনো বিশেষ প্রোগ্রামকে খুঁজে বার করার সমস্যা। ডিস্ক স্টোরেজে যেমন যে কোনো ট্র্যাকের যে কোনো সেক্টর থেকে অন্য ট্র্যাকের যে কোনো সেক্টরে লাফিয়ে যাওয়া যায় (যাকে বলে ডাইরেক্ট অ্যাকশেস) এবং ইচ্ছেমত যে কোনো প্রোগ্রাম চট্ করে খুঁজে বার করা যায়, টেপে সে কখনই সম্ভব নয়। আমাদের যদি টেপে রেকর্ড করা অজস্র প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে একেবারে শেষে রেকর্ড করা প্রোগ্রামটি পড়ার দরকার হয় তবে প্রথম থেকে একে একে অন্য সব কটি প্রোগ্রামকে রিড্/রাইট হেডের সামনে দিয়ে পার করে তবেই শেষ প্রোগ্রামটি পড়তে পারা যায়। অর্থাৎ এক কথায় টেপে পর পর যে ভাবে প্রোগ্রাম বা তথ্য রাইট্ করা হয়, রিড্ করার সময় ক্রমান্বয়ে সেই ভাবেই পর পর পড়তে হয়। একে বলে সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাকশেস (Sequential acess) পদ্ধতি। এই অসুবিধার জন্য কম্পিউটার চলা কালীন কম্পিউটারের সঙ্গে যে সেকেণ্ডারী তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় (যাকে বলা হয় Online Storage) সেই তথ্য সংরক্ষণের কাজে টেপ মিডিয়াকে কখনোই ব্যবহার করা হয় না। টেপ স্টোরেজকে বেশির ভাগ সময়ই হার্ড ডিস্ক বা ফ্লপি ডিস্ক মিডিয়াতে রেকর্ড করা তথ্য ব্যাকআপ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ব্যাকআপ করার সময় হার্ড ডিস্কের যাবতীয় (কিম্বা নির্বাচিত কয়েকটি) প্রোগ্রাম পরপর কার্টিজ টেপে রাইট্ করে রাখা হয়। এরপর যদি ওই ব্যাকআপ করা তথ্য পুনরায় কখনো দরকার পড়ে তাহলে কার্টিজ টেপ থেকে ওই তথ্য গুলি ফের হার্ড ডিস্কে কপি করে নেওয়া যায়।

অপটিকাল ডিস্ক—CDROM এবং WORM

ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হল CDROM এবং WORM স্টোরেজ। CDROM এর পুরো কথাটি হল Compact Disk Read Only Memory (কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড ওনলি মেমরি) এবং WORM এর পুরো কথাটি হল Write Once Read Mostly (রাইট্ ওয়ান্স রিড্ মোস্টলি)। এদুটিই হল অপটিকাল স্টোরেজ মিডিয়া। এতে তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা একদম মসৃণ ঘুরন্ত অপটিকাল ডিস্ক। ওই অপটিকাল ডিস্কের পিঠের ওপর চুলের থেকে সরু ভাবে ফোকাস করা লেসার রশ্মি দিয়ে পুড়িয়ে গর্ত করে বা ঝলসে রঙ পাল্টে ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। তথ্য পড়ার সময় অপটিকাল ডিস্কের ওপর অল্প ক্ষমতার লেসার রশ্মি ফেলা হয় আর ডিস্কের পিঠ থেকে প্রতিফলিত লেসার রশ্মিটি একটি ফোটো ডিটেক্টরের সাহায্যে বৈদ্যুতিক সংকেতে রুপান্তরিত করা হয়। ডিস্কের পিঠে গর্ত বা রঙের পরিবর্তনের জন্য প্রতিফলিত লেসার রশ্মির ঔজ্জ্বল্যেও পরিবর্তন হয়। ফলে ফোটো ডিটেক্টর তৈরি হওয়া বৈদ্যুতিক সংকেতেও পরিবর্তন ঘটে। ওই পরিবর্তন থেকে ডিজিটাল 1 এবং 0 তথ্য উদ্ধার করা হয়।

অপটিকাল স্টোরেজে তথ্য সংরক্ষণ ঘণত্ব হার্ড ডিস্কের থেকেও অনেক বেশি। তাছাড়া তথ্য লেখা বা পড়ার কাজে লেসার রশ্মির ব্যবহারের জন্য ডিস্কটির কোনো যান্ত্রিক ক্ষয় হয় না ফলে অপটিকাল ডিস্কে সংরক্ষিত তথ্যের নিরাপত্তাও ম্যাগনেটিক মিডিয়াতে রেকর্ড করা তথ্যের থেকে বেশি।

অপটিকাল স্টোরেজ ব্যবস্থা এখনও তার শৈশব কালে রয়েছে। এ ব্যবস্থার আরো উন্নতি ঘটবে। আগামী প্রজন্মের কম্পিউটারগুলির সঙ্গে সাধারণ পেরিফেরালস্ হিসেবেই হয়তো অপটিক্যাল ডিস্ক ব্যবহার করা হবে। তবে এখনো অপটিকাল স্টোরেজ ব্যবস্থা সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এই শব্দ গুলি মনে রেখো

Hard Disk—প্রচুর পরিমানে ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের জন্য তৈরি বিশেষ ম্যাগনেটিক ডিস্ক স্টোরেজ ডিভাইস।

Micron—10^6 meters

Cylinder—হার্ড ডিস্কের সব কটি সমান্তরাল ট্র্যাককে একত্রিত করে সিলিণ্ডার বলা হয়।

দশ

ছেবরকে ডেকে জাহাজের গতিপথ পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন শংকরকাকা। আমাদের এখন এগোতে হবে খুব ধীরে ধীরে। যাতে সমস্ত পরিস্থিতি ঠিকঠাক বিচার করে এগোনো যায়।

মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই ছবিটা স্পষ্ট হলো। আমাদের শক্তিশালী দূরবীনে দেখা গেল, একটা ছোট দ্বীপ। তাতে বেশ কিছুটা জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা দোতলা কাঠের বাড়ি, তার পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটা লোহার কাঠামো। কাকার মতে এটাই নাকি পেট্রোলিয়াম ড্রিলিংয়ের জন্য তৈরি-করা ডোরিক বা কাঠামো। তীরে একটা ছোট সাইজের মোটর বোটও বোধহয় রয়েছে।

সৃজনকাকা আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ!'

চোখ গোল করে ছেবর বলল, 'তাজ্জব কী বাত!'

সৃজনকাকা তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গীতে বললেন, দেখছি, আমার সন্দেহই ঠিক। মনে হচ্ছে, এই দ্বীপে হয়তো পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে। এসব নির্জন দ্বীপ থেকে ড্রিলিং করে পেট্রোলিয়াম বের করে পাচার করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। বলা যায় না, হয়তো এদের সঙ্গে সিংগাপুরের ওইসব চক্রের যোগ থাকতে পারে। বাদল, খবরের কাগজে সেই বিজ্ঞাপনের কথাটা মনে আছে তোর?'

শংকরকাকাও কাকার মতে সায় দিলেন, 'সত্যিই তো, এসব দ্বীপের খবর পোর্টব্লেয়ারে কেই বা রাখে! গত একশো বছরের মধ্যে কোনো পুলিশ বোট এসব অঞ্চল দিয়ে গেছে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া আসবেই বা কেন, ম্যাপেও তো এই নতুন দ্বীপের কোনো অবস্থান দেখানো নেই।'

ঠিক হলো, রাত গভীর না হলে আর এগোনো ঠিক হবে না। কারণ দিনের আলোয় ওরা যদি আমাদের দেখতে পেয়ে যায়, তবে অনর্থক বিপদের মধ্যে পড়ে যাব। রাত একটু বাড়লে দ্বীপের কাথাকাছি এগিয়ে নৌকোয় চেপে দ্বীপে নামা যেতে পারে। কিন্তু পুলিশকেও তো খবরটা জানানো দরকার।

ওয়ারলেসে যোগাযোগ করতেই পুলিশ বোটের খোঁজ পাওয়া গেল গতকাল আমাদের কাছ থেকে খবর পেয়েই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা পুলিশ বোট এদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে সেই পুলিশ বোট এখনো আমাদের চেয়ে প্রায় একশো মাইল পেছনে। পারুবা দ্বীপের অবস্থানও জানিয়ে দেওয়া হলো ওদের।

রাত প্রায় আটটা নাগাদ পারুবা দ্বীপের কাছে নোঙর করল আমাদের জাহাজ। রাতের খাওয়া দাওয়া আমরা আগেই সেরে নিয়েছি। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, পুলিশ বোট এসে পৌঁছলে আমাদের অভিযান একসঙ্গে শুরু করা হবে। কিন্তু সৃজনকাকা পুলিশের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিতে নারাজ। কারণ সে-ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কৃতিত্বই আর থাকবে না। শংকর কাকা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করবার পক্ষপাতী ছিলেন। পরে সৃজনকাকার কথায় মত বদলে বললেন, 'পুলিশ তো আসছেই আমাদের পেছনে পেছনে। এর মধ্যে আমরা যদি কোন খবরাখবর বের করতে পারি, তবে সকলেরই লাভ। দ্বীপে নেমে যদি তেমন কোনো বিপদে পড়ি তাহলে অবশ্য পুলিশের সাহায্যের দরকার হবে।

শেষ পর্যন্ত সৃজনকাকা, শংকরকাকা, আমি ও ছেবর নৌকায় চেপে দ্বীপে পৌঁছলাম। প্রথমে টমাস ও আমার জাহাজে থাকবার কথা ছিল। পরে আমার পীড়াপীড়িতে ঠিক হলো, জাহাজে থাকবে সুভাষ ও টমাস। পুলিশ বোট এলো তাদের তো পথ দেখাতে হবে, তাছাড়া ওয়ারলেসেও খবরাখবর পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে জাহাজে সুভাষের থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া জাহাজ চালানোর দরকার হলে সামাল দিতে পারবে।

অন্ধকারে সমুদ্রতীরের বালিতে নামলাম আমরা সকলে। চারদিকে বেশ অন্ধকার। তবু অন্ধকারে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি বেশ সয়ে এসেছিল। শংকরকাকার কাঁধে ডবল ব্যারেল বন্দুক, সঙ্গে যথেষ্ট গুলিগোলা। কাকার কাছেও রিভলভার রয়েছে। ছেবরের হাতেও বেশ বড় আকারের ছোরা। ওর কাছে এই দু'নম্বর ছোরাটা আগে থেকেই ছিল। এবার অবশ্য আমার কাছে বোমা-টোমা কিছু নেই, শুধু অন্ধকারে পথ দেখাবার জন্য পাঁচসেলী একটা টর্চ। আমরা চারজন নিঃশব্দে সমুদ্রতীরের বালির ওপর দিয়ে চললাম। প্রত্যেকের মনেই গভীর আশংকা, কোন বিপদ ঘাপটি মেরে আছে, কে জানে! সমুদ্রতীরে শুধু বালি নয়, প্রচুর শক্ত এবড়ো খেবড়ো পাথর, প্রবালের টুকরো। পথ চলতে প্রতি পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে। অবশ্য সামনেই উঁচু ডাঙা। তারপর একটা রাস্তা, প্রবালের টুকরো দিয়ে তৈরি। রাস্তা খুব মসৃণ নয়, তবে জিপ বা ল্যাণ্ড-রোভার ধরনের গাড়ি চলাফেরা করতে পারে। আমাদের খুবই সাবধানে এগোতো হচ্ছে, যাতে ঝট করে বিপদের মুখে পড়ে না যাই। জাহাজ থেকে বড় দোতলা কাঠের বাড়িটা যত কাছে মনে হয়েছিল, দেখা গেল ততটা কাছে নয়। অদূরে জেনারেটারের ফটফট শব্দ। বিদ্যুতের আলোও চোখে পড়ল।

এখানে যারাই আস্তানা গেড়ে থাকুক, তারা বেশ প্ল্যান মাফিক সবকিছু করে যাচ্ছে। অথচ আন্দামানের লোকজন কেউ এর হদিশই রাখে না। তাজ্জব ব্যাপার!

রাস্তার ধারে ধারে কাঠের ল্যাম্প পোস্ট, তাতে বালবের আলো। কিন্তু পাছে কারো নজরে পড়ে যাই, তাই রাস্তা আর আলো এড়িয়ে চলছিলাম। খানিকটা এগোতেই চোখে পড়ল, টিনের শেড দেওয়া একটা বাড়ি। সেখান থেকেই ফটফট আওয়াজ বেরোচ্ছে।

শংকরকাকা ফিসফিস করে বললেন, 'এটাই বোধহয় এদের পাওয়ার হাউস।'

পাওয়ার হাউসের দরজা খোলা। ভেতর থেকে দু'চার জন লোকের আওয়াজ পাওয়া গেল, কিন্তু বাইরে কাউকেই দেখতে পেলাম না। পাওয়ার হাউস বাঁ দিকে রেখে আমরা এগোলাম। সামনের রাস্তাটা বাঁ দিকে বেঁকেছে। বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই নজরে এলো, প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে উঁচু লোহার কাঠামো। সৃজনকাকাই দেখালেন।

কিছুদূরে ডানদিকে গোটা কয়েক ব্যারাক টাইপের কাঠের বাড়ি। গোটের কাছে কী যেন লেখা পড়তে পারা গেল না। খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম, সব কিছুই চীনা নাকি জাপানী ভাষায় লেখা। নিচে অবশ্য ইংরেজিও রয়েছে।

আমরা বাড়িগুলির দিকে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ ছেবর শংকরকাকার জামা টেনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সবাই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই ছেবরের টানে ছিটকে এলাম একটা ঝোপের

টিনের শেড দেওয়া একটা বাড়ি। সেখান থেকেই ফটফট আওয়াজ বেরোচ্ছে।

আড়ালে। আর পরক্ষণেই একটা জিপ হুশ করে আমাদের পাশ দিয়ে বুলেটের মতো বেরিয়ে গেল। তবে ভাগ্য ভালো, একটুর জন্য জিপের লোকজন আমাদের দেখতে পায় নি। জিপটা অবশ্য খুব বেশি দূরে গেল না। একটু এগিয়ে ব্যারাকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঝোপের আড়াল থেকে আমরা সবকিছুই লক্ষ্য করছি। জিপ থেকে প্রথমে নামল মুখ-থ্যাবড়া মঙ্গোলীয় চেহারার ভদ্রলোক। নেমেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি ও দুর্বোধ্য কোন ভাষায় কী যেন বলল। তারপর একজন গার্ড। এ লোকটিকেও মঙ্গোলীয় বলেই মনে হয়। লোকটার কাঁধে বন্দুক। এরপর জিপ থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে দেখে ভুত দেখার মতো চমকে উঠলাম। এই ভদ্রলোক আর কেউ নন, গেস্ট হাউসের মিঃ সূর্য সোম। আমি তো অবাক হয়ে ডাকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই আমার মুখে হাতচাপা দিয়ে থামিয়ে দিলেন সৃজনকাকা। তাহলে মিঃ সোমও এদের সঙ্গে জড়িত। অথচ ভদ্রলোককে দেখে কী দারুণ ভদ্র, বিনয়ী আর অমায়িক বলেই না মনে হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি পোর্ট ব্লেয়ারের গেস্ট হাউসে মঙ্গোলীয় চেহারার মানুষের আনাগোনা আর টাকা পয়সা লেনদেনের রহস্য।

কিন্তু আরো বিস্ময়ের বাকি ছিল। এরপর যিনি নামলেন তাকে দেখে আমরা সবাই শুধু অবাক নয়, একেবারে হতভম্ব। ইনি খনিজ তেল বিশেষজ্ঞ ডঃ শ্রীবাস্তব, যাকে আন্দামানের পুলিশ গত সাতদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শ্রীবাস্তবচাচা গেস্ট হাউস থেকে সেই যে আচমকা উধাও হলেন, তারপর থেকে তাঁর হদিশ আর কেউ জানে না। অথচ তিনি এখন আমাদের সামনেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখন আমরা নিতান্তই অসহায়। ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কোন উপায়ই নেই। পাশেই যমদূতের মতো বন্দুকধারী গার্ড। তাকিয়ে দেখলাম, শ্রীবাস্তবচাচার চেহারা একদিনে বেশ খারাপ হয়ে গেছে।

মঙ্গোলীয় লোকটা পাশের গার্ডকে কী যেন ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে গার্ডটিও শ্রীবাস্তবচাচাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। একটু পরেই মঙ্গোলীয় চেহারার ভদ্রলোক ও মিঃ সোম জিপে চড়ে অয়েল ডোরিকের দিকে চলে গেলেন।

জিপটা চলে গেলে ঝোপের ভেতর থেকে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। আমাদের ভাগ্য ভালো এখন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাই ঝট করে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম। রাস্তায় যে ক'টা আলো জ্বলছে তাতে বেশিদূর নজর যায় না।

এখন আমাদের কাছে সবকিছু পরিষ্কার, এখানে এই পারুবা দ্বীপে একটি আন্তর্জাতিক দুষ্টচক্র কীভাবে তাদের গোপন কাজকর্ম চালাচ্ছে। এদের কাজকর্ম যে কী, তা' পুরো-বোঝা না গেলেও এটুকু বুঝতে কোন অসুবিধি নেই, এদের প্রধান কাজ মাটির তলা থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ। আর এই প্রয়োজনেই এরা ধরে নিয়ে এসেছে অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ডঃ শ্রীবাস্তবকে। হয়তো জোর করেই এখানে কাজ করতে বাধ্য করছে। কত অত্যাচার নির্যাতনই না এঁকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে, সেকথা ভেবে খুব কষ্ট হলো আমার। বেচারা শ্রীবাস্তবচাচা!

এই বদমায়েসদের খপ্পর থেকে শ্রীবাস্তবচাচাকে উদ্ধার করতে পারব কিনা কে জানে!

এখন আমাদের প্রধান কাজ ডঃ শ্রীবাস্তবকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করা।

কিন্তু কী ভাবে? অবশ্য কোনোরকমে একবার মুক্ত করতে পারলেই সোজা জাহাজে। এর মধ্যে পুলিশ বোট এসে গেলে বাকি ব্যাপারগুলোর মোকাবিলা সহজেই করা যাবে।

কিন্তু কীভাবে শ্রীবাস্তবচাচার কাছে পৌঁছনো যায়? পৌঁছতে পারলেও কী করেই বা এদের কবল থেকে মুক্ত করা যাবে?

ব্যারাক টাইপের বাড়িগুলো কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। যদিও গেটটা খোলা আর গেটে কোনো পাহারাদার নেই, তবু গেটের কাছে যথেষ্ট আলো। তাই ওদিক দিয়ে ঢুকতে গেলে শত্রুদের নজরে পড়বার সম্ভাবনা ষোল আনা। তাই ওদিককার কথা চিন্তা না করে ভাবতে হবে আর কোনদিক দিয়ে ঢোকা যায়!

ছেবর ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিন আমি শ্রীবাস্তবসাহেবের খবর নিয়ে আসছি—'

শংকরকাকা একটু চিন্তিত গলায় বললেন, কিন্তু তুমি এর আগে কোনোদিন তো ডঃ শ্রীবাস্তবকে দেখো নি। আজ এই একবার দেখেই চিনতে পারবে কি? তাছাড়া উনিই বা বুঝবেন কী করে যে তুমি আমাদেরই লোক।'

'সে ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন। অবচ্ছা আলোয় একবার যা দেখেছি তাই যথেষ্ট। ওর গায়ে দেখলাম হলুদ স্ট্রাইপ শার্ট—'

'তুমি তাহলে আমার বন্দুকটা নিয়ে যাও। যদি কোনো বিপদ—'

'না স্যার, বিপদে পড়লে ছোরাটা আছে তাতেই কাজ চলে যাবে। আমি লোকাল বর্ণ। বন্দুকের চেয়ে ছোরা চালানোই ভালো আসে আমার। তাছাড়া আপনারা তো এখানে রইলেন। যদি তেমন কিছু হয়—'

ছেবর চলে গেল। ও ব্যারাকের পেছন দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করবে। আমরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কী খবর নিয়ে ফিরে আসে ছেবর।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরল ছেবর। ওর আনা খবর আমাদের মানসিক জোর বাড়িয়ে দিল অনেকটাই। ব্যারাকের শেষপ্রান্তে একটা মাঝারি সাইজের ঘরে আটকে রেখেছে শ্রীবাস্তবকে আর ঘরটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে সেই মঙ্গোলীয় পাহারাদার। মনে হয় পাহারাদার সতর্ক নয় কারণ এরকম সমুদ্রেঘেরা অজানা দ্বীপ থেকে কারো পক্ষেই পালানো সম্ভব নয়। তবু ওরা কোন ঝুঁকি নিতে চায় না বলেই আটকে রেখেছে ডঃ শ্রীবাস্তবকে। তবে এখানে একটাই স্বস্তির কথা এখন ওই চত্বরে মাত্র একজনই পাহারাদার।

তাই ছেবরের কথামতো ঠিক হলো আমরা সবাই বাড়িটার পেছন দিক দিয়ে চত্বরের ভেতরে ঢুকব। এতে কোন অসুবিধে হবে না। কারণ কাঁটাতারের বেশ খানিকটা অংশই কেটে রেখে এসেছে ছেবর।

ছেবরের নির্দেশ অনুযায়ী কাঁটাতারের ছেঁড়া জায়গাটা দিয়ে আমরা সবাই চত্বরের ভেতরে ঢুকলাম। চত্বরের ভেতরে বেশ কিছু প্যাডক গাছ। মনে হলো এই গাছগুলোর আড়ালেই বেশ লুকিয়ে থাকা যায়। গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম পাহারাদারের জন্য। ঠিক করেছিলাম, পাহারা দিতে দিতে লোকটা এদিকে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব লোকটার ঘাড়ে। তারপর অজ্ঞান করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে আর কতক্ষণ!

কিন্তু পাহারাদার আর এদিকে আসেই না। কী হলো! হঠাৎ গলার আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি একটা নয় দু'দুজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। দুজনের কাঁধেই বন্দুক।

সৃজনকাকা বললেন, 'এবার উপায় —'

ছেবর ঠোঁট চেপে উত্তর দিল, 'দেখা যাক। আর একটু বেশি সময় না হয় অপেক্ষা করি। পরে কিছু একটা উপায় বেরোবেই—

অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ আমাদের গাছের দিকেই এগিয়ে এলো। অন্ধকারে লোকটা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট না হলেও আমরা সবাই বুঝতে পারছি, লোকটার মঙ্গোলীয় মুখ। কি ভেবে যেন লোকটা আমাদের গাছের কাছে এসে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটার ঘাড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেবর। আচমকা আক্রমণের জন্য লোকটা মোটেই তৈরি ছিল না। তাই ছোরার বাট দিয়ে কয়েক ঘা দিতেই অজ্ঞান। আমরা সবাই লোকটাকে টেনে টেনে গাছের নিচে নিয়ে এলাম।

এদিকে এই লোকটা ফিরে না যাওয়ায় অন্য পাহারাদার কী যেন বলতে বলতে খুঁজতে এলো লোকটাকে, 'ফুং চুং, ক্যাং ল্যাং ...সিউ...মিং...'

লোকটা আর একটু এগিয়ে আসতেই, ছেবর আবার লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু ছেবরের হিসেবে ভুলের জন্য নাকি লোকটা বেশি সতর্ক ছিল বলেই ছেবর অল্পের জন্য ফসকে গেল লোকটাকে। একটু সরে গিয়ে লোকটা কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে ছেবরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা আমার বাঁ' কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। আর একটু হলেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল আর কি!

পরমুহূর্তেই ছেবর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই উলটে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই দু'হাত দিয়ে লোকটার গলাটা দারুণ জোরে চেপে ধরল ছেবর। ওর হাতের কঠিন চাপে ধীরে ধীরে জ্ঞান হারাল লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে আর সময় নষ্ট না করে আমরা ছুটে গেলাম ডঃ শ্রীবাস্তবের ঘরের দিকে। পাহারাদারের পকেটে ছিল এক গোছা চাবি। তারই একটা দিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল তালা।

দেখলাম, মাথা নিচু করে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে আছেন ডঃ শ্রীবাস্তব। সামনের টেবিলে রাতের খাবার। কিন্তু উনি সেগুলো একবারও ছুঁয়ে দেখেন নি।

ডঃ শ্রীবাস্তব আমাদের দেখে যেন চমকে উঠলেন, একি! কে আপনারা—'

সৃজনকাকা নিচু গলায় বললেন, 'ডঃ শ্রীবাস্তব, আমি সৃজন বোস। আমাকে চিনতে পারছেন না? শিগগির চলুন, এক্ষুনি পালাতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।'

সৃজনকাকার কথায় ডঃ শ্রীবাস্তবের মুখে উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল, 'আপনারাই তাহলে গুলি ছুঁড়েছিলেন। আমি আমি ভাবলাম, এখানে আবার কি হলো!'

'তাই তো বলছি, তাড়াতাড়ি করুন। গুলির আওয়াজ ওরাও নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে। ওদের হাতে একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। আমাদের সকলকে কচুকাটা করে ছাড়বে।'

ডঃ শ্রীবাস্তবকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সমুদ্রের দিকে। রাস্তা এড়িয়ে উঁচু নিচু পাথর ডিঙিয়ে ছুটলাম। দূর থেকে ভেসে আসছিল জিপের আওয়াজ। কিন্তু ক্রমেই দ্রুত এগিয়ে আসছে জিপটা। তবে আমাদের একমাত্র ভরসা অন্ধকার, নিঃসীম অন্ধকার। জীবনে আর কোনোদিন এমন আকুল হয়ে এমনভাবে অন্ধকার প্রার্থনা করি নি। কিন্তু তবু চারিদিকে বেশ কতগুলো ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ।

যাই হোক, পাওয়ার হাউসের পাশ দিয়ে কোনোরকমে

[শেষাংশ 43 পৃষ্ঠায়]

উড়ন চাকি রহস্য

আকাশে উড়ন্ত অজানা বস্তু? সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখেছে এই উড়ন্ত প্রহেলিকাদের। জমা পড়েছে হাজারে হাজারে লিখিত প্রতিবেদন। হয়ত এদের অধিকাংশ দৃষ্টিবিভ্রম; উল্কা, গ্রহ, নক্ষত্র, বেলুন, জলার গ্যাস অথবা বায়ুমণ্ডলের আলোড়ন। কিন্তু বাকিগুলো যে প্রকৃতই অব্যাখ্যাত রহস্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক মোটা মোটা কেতাব লেখা হয়ে গেছে আকাশের এই অজানা রহস্যময় বস্তুদের নিয়ে। সিনেমাও হয়েছে অনেক। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এরা অনেক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে গেছে। পুরানের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আজকের উড়ন্ত চাকিদের মিল রয়েছে। ফ্যানটাসি অনেকেই ভালবাসেন, কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি বলেন? চাঞ্চল্যকর এই প্রতিবেদন সেই সবেরই মধ্যে শ্বাসরোধী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বললেও চলে।

1800 সালের আগে

আধুনিক মানুষ এই পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়ানোর অনেক আগেই আকাশে দেখা গেছিল অদ্ভুত বস্তুদের। চোঙার মত দেখতে—এ যুগের মহাকাশযানের মত। চীনদেশের এক দ্বীপে গ্র্যানাইট পাহাড় আর পাথরে খোদাই করা হয়েছে এদের আকৃতি—প্রায় 47000 বছর আগে।

প্রথম লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে 3400 বছরের প্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরাস পুঁথিতে।

বাইবেলেও তো রেয়েছে এই ধরনের কাহিনী। ধর্মগুরু ইজকেল 'দিব্যদৃষ্টি' দিয়ে দেখেছিলেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হচ্ছে চাকাওলা গাড়ি। চারজন আরোহী নেমে এসেছিল ধরণীর ধুলোয়। তাদের প্রত্যেকের চারটে মুখ আর চারটে ডানা। কারা এরা? মাথায় স্পেশ-হেলমেট, পরনে স্পেশ-সুট, কাঁধে আকাশে ওড়ার যন্ত্র লাগানো মহাকাশচারী নয়তো? অথবা অন্য গ্রহ থেকে আগন্তুক উড়ুক্কু রোবট? সবুজ দ্যুতিময় মহাকাশযানের গায়ে সারি সারি পোর্ট-হোলের মধ্যে দিয়ে এরা যাতায়াত করেছে কি বারবার? ইজকেলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আশ্চর্য এই আকাশযানে। ভিন গ্রহীদের হাতে মানুষ গায়েবের আধুনিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে নাকি?

আজ থেকে প্রায় 1500 বছর আগে রোমীয় লেখকের লেখাতেও বিচিত্র আকাশ-রহস্যের বর্ণনা আছে। উড়ন-চাকি তত্ত্ব দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায় এই প্রহেলিকাদের।

ফ্রান্সের ভার্দুন শহরের মিউজিয়ামে একটা ছাপা বই আছে। এ বই লেখা হয়েছিল 1493 সালে। চুরুটের মত গড়ন আগুনঘেরা আকাশ-রহস্যের এই বর্ণনাই কিন্তু ইউরোপে উড়ন-চাকি দর্শনের প্রথম লিখিত বিবরণ।

'ফ্লাইং সসার' কথাটা আজকের যুগে সবাই জানে। কিন্তু অনেকের জানা নেই, পাশ্চাত্য দেশে 'ফ্লাইং সসার' নামটা চালু হওয়ার প্রায় 700 বছর আগে জাপানীরা এই শব্দ-যুগল ব্যবহার করেছে। 1180 খ্রীস্টাব্দের 27 অক্টোবর রাতের আকাশে চকচকে এবং রীতিমত অস্বাভাবিক একটা বস্তু দেখা গেছিল দেখতে অবিকল 'উড়ুক্কু মাটির সরা'র মত।

1800 থেকে 1948 সালের মধ্যে

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-প্রকাশনাগুলো ফ্লাইং সসারদের নিয়ে মাতামাতি শুরু করে। উড়নচাকি নামক কপোল কল্পনাদের আর উপেক্ষা করতে পারেনি ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশন সংস্থারা। যেমন, মেক্সিকোর একটা রিপোর্ট। অতিকায় রণভেরীর মত একটা বিস্ময়কে দেখা গেছিল মিনিট কয়েক ধরে রাতের আকাশে। পেছন দিক দিয়ে ঠিকরে আসছিল তীব্র আলোকধারা। লম্বায় প্রায় 425 ফুট (6 জুলাই, 1874)।

'সসার' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন টেক্সাসের এক কৃষক (1878)।

1906 সালে পারস্য উপসাগরে একটা অতিকায় আলোকময় চাকা দেখা গেছিল। দেখেছিল 'ভালচার' নামে বৃটিশ জাহাজের খালাসীরা। চাকার ব্যাস প্রায় 130 ফুট। 'পাটনা' নামে বৃটিশ জাহাজ থেকে দ্যুতিময় বিশাল চাকাকে আবার দেখা গেল পরের বছর। ঘুরন্ত চাকা পরের কয়েক বছরেও দেখা দিয়ে যায় চীন সাগর আর পারস্য উপসাগরে।

1800র শেষের দিকে উড়নচাকি হইচই ফেলে দেয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। 1896র 22 নভেম্বর সানফ্রান্সিসকোর খবরের কাগজে ছবিসহ ছাপা হয় লোমহর্ষক ঘটনাগুলো।

রুশশিল্পী নিকোলাই রোয়েরিখ ভারত এবং চীন

দেশে পাঁচ বছর ধরে টো-টো করার সময়ে উত্তর চীনে অদ্ভুত আকাশ-বিস্ময়কে নিজের চোখে দেখেন। ডিমের মত চকচকে বস্তুটার বিবরণ লিখেও যান। রোয়েরিখ বড়-দরের শিল্পী বাজে কথা বলার লোক নন। নিউইয়র্কে রোয়েরিখ মিউজিয়ামে আছে তার আঁকা ছবি!

জানুয়ারি 1988 সংখ্যা থেকে পুনরমুদ্রণ

প্রাক কথনঃ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে আশ্চর্য এই প্রতিবেদনগুলোর বিচারক হতে চাই না—কিন্তু প্রতিটি ঘটনাকে যথাযথভাবে নথিভুক্ত তো করতে পারি। বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনায় অগ্রণী লেখক অদ্রীশ বর্ধন আমাদের বারোটি আশ্চর্য কাহিনী শোনাবেন। সংশয় আর অবিশ্বাস তো থাকবেই। নিছক গল্প-কাহিনী হিসেবে পড়তেই বা আপত্তি কি? এবং অগণিত সাক্ষীর প্রত্যেকেই আজগুবি কথা বলেছেন কিনা—এ সন্দেহের সত্যি মিথ্যে যাচাইও হওয়া চাই।

—সম্পাদক

1946 সালে ইউরোপের আকাশে ঘন ঘন দেখা দিয়েছে 'ভুতুড়ে রকেট'। সবচেয়ে বেশি হানা দেয় সুইডেনের আকাশে। প্রায় হাজার বার। সন্দেহ হয় সুইডিশ সরকারের। সোভিয়েত দেশের কাণ্ড নয়তো? বোমাবর্ষণ শুরু হবে না তো? সতর্ক করে দেওয়া হয় সৈন্যবাহিনীকে। জোর তদন্তও হয়। কিন্তু এক পঞ্চমাংশ ভুতুড়ে রকেটের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তারা রহস্যময় অজানা বস্তু হিসেবে আজও নথিভুক্ত। 1948 সালে লণ্ডন 'টাইমস' পত্রিকার খবরে জানা যায়, ভুতুড়ে রকেটরা আবার টহল দিয়ে যাচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলোয়। নীল-সবুজ আগুন ছড়িয়ে ধেয়ে যাচ্ছে ঘণ্টায় 6700 মাইল গতিবেগে মাটি থেকে 25,000 ফুট উচ্চতায়। পৃথিবীর নানা জায়গায় ভুতুড়ে রকেটদের আজও দেখা যাচ্ছে, নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা গেছে।

উড়নচাকির ইতিহাসে ক্লাসিক কেস হল কেনেথ আর্নল্ডের ঘটনা (24 জুন, 1947)। নিজের এরোপ্লেনে কাসকেড পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ে দেখেছিলেন ঝকঝকে ন'টা বস্তু তীব্রবেগে উড়ে আসছে তাঁর প্লেনের দিকে—ঘণ্টায় 1600 মাইল গতিবেগে। সে যুগে এত জোরে উড়তে পারত না কোন উড়োজাহাজ।

সেই হল শুরু। ঠিক দশদিন পরে যুক্তরাষ্ট্র বিমান-বাহিনী থেকে একই খবর এল। এবার দেখা গেছে হুবহু একরকমের পাঁচটা উড়ুক্কু বিস্ময়কে।

এই দুটি ঘটনার পর আমেরিকার এয়ারফোর্স সরকারী পর্যায়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন উড়নচাকিদের প্রসঙ্গে।

উড়নচাকি নিয়ে তদন্ত

ইউ-এফ-ও অর্থাৎ আন-আইডেণ্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট-দের সরকারী নথিভুক্তির ইতিহাস আরম্ভ হয় 1948 সালে। যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্স সৃষ্টি করেন 'প্রোজেক্ট সাইন'। পরের বছর 'প্রোজেক্ট সাইন' হয়ে যায় 'প্রোজেক্ট গ্রাজ' এবং তারপরে 'প্রোজেক্ট ব্লু-বুক'।

'প্রোজেক্ট ব্লু-বুক'য়ের উদ্দেশ্য ছিল উড়ন চাকিদের নিয়ে তত্ত্বতল্লাসি চালানো। সমালোচকরা অবশ্য বলেন, পুরো ব্যাপারটা লোক ভুলোনো ছেলেখেলা। সাধারণ মানুষের মনের ভয় কাটানোই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই কোন বৈজ্ঞানিক মাথা রাখা হয়নি বিশেষ এই প্রকল্পে।

আসলে কিন্তু দারুণ কাজ দিয়েছে 'প্রোজেক্ট ব্লু-বুক' 18 বছরে 12600 রিপোর্ট খতিয়ে দেখেছে এবং 701টা উড়ন-চাকিকে 'অজ্ঞাত বস্তু' বলে রায় দিয়েছে।

1966 সালে যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ফোর্স জনাকয়েক বৈজ্ঞানিককে নিয়ে ইউ-এফ-ও তদন্ত জোরদার করে তোলেন। দু বছরে 9টা কেস নিয়ে তদন্ত চলে। 23টা ঘটনার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। রিপোর্টের ভাষায় 'বিজ্ঞানের ভাঁড়ারকে সমৃদ্ধ করার মত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি এই 23টা ঘটনা থেকে'।

আজও অনেকের বিশ্বাস, ইউ-এফ-ও নিয়ে গুপ্ত তদন্ত চলেছে এবং এখনও চলছে যুক্তরাষ্ট্রের খুব উঁচু সরকারী মহলে।

বেসরকারী সংস্থারাও লেগেছে কোমর বেঁধে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্থাটা যিনি স্থাপনা করেন, তাঁর নাম ডক্টর জে অ্যালেন হাইনেক। জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রোজেক্ট ব্লু-বুকয়ের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ছিলেন। 1982 সালের মধ্যে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে 70000 উড়ন চাকি দর্শনের ঘটনা কমপিউটারে নথিভুক্ত করা হয়। এক পঞ্চমাংশ ঘটনা অব্যাখ্যাত থেকে যায়। এদের ক্ষেত্রে দরকার আরও জোরালো তদন্ত।

অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে ফ্রান্স, বৃটেন আর অস্ট্রেলিয়াও পেছিয়ে নেই উড়নচাকি তদন্তে।

আর্নল্ড-ই প্রথম সাড়া জাগান আধুনিক উড়নচাকিদের ব্যাপারে। বিষয়টা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায় রেডিও আর পত্র-পত্রিকার দৌলতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর উৎসাহে।

1948য়ের পর

বিশ বছর 'প্রোজেক্ট সাইন' 'আর প্রোজেক্ট ব্লু-বুক'য়ে উপদেষ্টা হিসেবে মাথাঘামানোর পর, ডক্টর জে অ্যালেন হাইনেক উড়নচাকি দর্শনের ঘটনাগুলোকে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করেন।

প্রথম বড় শ্রেণীতে আছে সেই সব উড়নচাকিদের ঘটনা যাদের দেখা গেছে 500 ফুটেরও বেশি দূরত্ব থেকে। এদের আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে নৈশ আলো (এমন সব সুস্পষ্ট আলো যাদের প্রচলিত আলোক-উৎস দিয়ে বোঝানো যায় না); দিনের চাকতি (ডিমের মত অথবা ডিসকের মত ধাতুর তৈরি বস্তু); রাডারে দর্শন (রাডারের স্ক্রীনে অজ্ঞাত ব্লিপ শব্দ—একই সঙ্গে পাওয়া গেছে তাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ)।

দ্বিতীয় বড় শ্রেণীটায় পড়ছে 500 ফুটের মধ্যে দেখা উড়নচাকিদের ঘটনা। এদের আবার ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে ঃ

ক্লোজ এনাকউন্টার্স অফ দ্য ফার্স্ট কাইণ্ড

যে সবক্ষেত্রে ইউ-এফ-ও'দের সঙ্গে আশপাশের কোন কিছুর লেন দেন বা যোগাযোগ ঘটেনি। অর্থাৎ শুধু দেখা দিয়েই উধাও হয়েছে।

ক্লোজ এনকাউন্টার্স অফ দ্য সেকেণ্ড কাইণ্ড

এই সব ক্ষেত্রে উড়নচাকিরা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে গেছে। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন চাবিঘোরালেও চালু হয় নি, মাটিতে পাওয়া গেছে পোড়া দাগ, মানুষ বা পশু দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগেছে।

ক্লাজ এনকাউন্টার্স অফ দ্য থার্ড কাইণ্ড

এই সবক্ষেত্রে নাকি উড়নচাকির আরোহীদের দেখা গেছে।

ক্লোজ এনকাউন্টার্স অফ দ্য ফোর্থ কাইণ্ড

সম্প্রতি খবর এসেছে, কিছু মানুষের সঙ্গে উড়নচাকির আরোহীরা কথা বলেছে, কোথাও টক্কর লেগেছে, এমন কি মানুষকে উড়নচাকিতে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে ফেরৎ দিয়ে গেছে।

গত চল্লিশ বছরের কিছুটা ঘটনা

'নৈশ আলো' শ্রেণীর একটা ঘটনা বলা যাক।

জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে জর্জিয়ার গভর্নর ছিলেন। উড়নচাকি দেখেছিলেন সেই সময়ে।

সেদিন ছিল স্থানীয় লায়নস ক্লাবে ভাষণ দেওয়ার দিন (6 জানুয়ারি, 1969)। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়ে ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন জনা বারো ব্যক্তির সঙ্গে। এই সময়ে আকাশ বিস্ময় চমকিত করে যায় জিমি কার্টারকে।

উনি যা দেখেছিলেন এবং যা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তা হুবহু প্রকাশ পায় 'ন্যাশ্যাল এনকোয়ারার' পত্রিকায় (8 জুন, 1976) ঃ

'আমার দৃঢ় বিশ্বসে, উড়নচাকিদের অস্তিত্ব আছে, কারণ আমি একটাকে দেখেছি....অদ্ভুত আবছাটে, কিন্তু দেখেছেন আরও প্রায় বিশজন...এ রকম বিচিত্র বস্তু জীবনে কখনও দেখিনি। বিশাল। ভীষণ উজ্জ্বল। রঙ পালটাচ্ছিল ঘন ঘন। আকারে চাঁদের মত। দশ মিনিট ধরে দেখেছিলাম এই জিনিসকে। কেউই কিন্তু বুঝতে পারিনি বস্তুটা কী হতে পারে –

1973য়ের অক্টোবরে গভর্নর জিমি কার্টার জাতীয় তদন্ত কমিটির কাছে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশদভাবে লিখে জানান।

এবার আসা যাক 'দিনের চাকতি' ঘটনাবলী প্রসঙ্গে। একটা ঘটনাই যথেষ্ট।

জায়গাটার নাম ফারমিঙটন, নিউ মেক্সিকো। তারিখ, 18 মার্চ, 1950। তল্লাটের প্রায় 5000 মানুষ দেখেছে, 'কয়েকশ আশ্চর্য উড়ুক্কু বস্তু'। এদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং মেয়র, খবরের কাগজের লোকেরা এবং হাইওয়ে পুলিশ। তখন রোদ বেশ চড়া। কয়েকশ বিচিত্র বস্তু আকাশে সার্কাস দেখিয়ে চক্ষু চড়কগাছ করে দিয়ে যায় শহরশুদ্ধ লোকের। চক্ষের নিমেষে নয়—সময় নিয়েছে একঘণ্টারও বেশি। সুতরাং ব্যাপারটাকে চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে চান না 5000 মানুষ। এঁদের বর্ণনা অনুসারে আকাশ-বিস্ময়দের দেখতে স্পেশশিপের মত। গতিবেগ ঘণ্টায় 1000 মাইল। খেলা দেখাচ্ছিল দল বেঁধে। চকিতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল পরস্পরকে—সংঘর্ষ অনিবার্য মনে হলেও হয়নি। দুপুর নাগাদ উধাও হয় উড়নচাকিরা—আবার ফিরে আসে বিকাল নাগাদ।

'রাডার দর্শনের' একটা ঘটনা আরও বিস্ময়কর।

প্যারিসের ওর্লি এয়ারপোর্টের কণ্ট্রোল রুম। 19 ফেব্রুয়ারি 1956। সন্ধে হয়েছে। আচমকা রাডার পর্দায় শোনা গেল ব্লিপ-ব্লিপ আওয়াজ, দেখা গেল আলোক সঙ্কেত। মামুলি উড়োজাহাজের যে প্রতিধ্বনি শোনা যায়, এই প্রতিধ্বনি তার দ্বিগুণ। রাডারের আলোও অদ্ভুতভাবে উঠছে, নামছে, ভাসছে, আর তারপরেই নাটকীয়ভাবে প্রচণ্ড গতিবেগ তুলে ফেলছে। এ রকম স্পীড আর ওঠা-নামা থেমে থাকা কোনো উড়োজাহাজ চালক ভাবতেই পারতেন না।

ঠিক এই সময়ে রাডার স্ক্রীনে জাগ্রত হল একটা পরিচিত ব্লিপ-ব্লিপ ধ্বনি আর আলোর নিশানা। এয়ার ফ্রান্স ডগলাস ডাকোটা প্লেন যাচ্ছে প্যারিস-লণ্ডন পথে। রোজই যায় ঠিক এই সময়ে।

কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে তৎক্ষণাৎ খবর গেল এই প্লেনে —হুঁশিয়ার। তোমার পথেই এসে গেছে একটা উড়নচাকি।

উড়ন্ত ডাকোটার রেডিও অফিসার হুঁশিয়ার বাণী শুনেই তাকিয়েছিল পোর্টহোল দিয়ে বাইরে এবং তাজ্জব হয়ে গেছিল একটা প্রকাণ্ড অস্পষ্ট লোহিতদ্যুতি সমাচ্ছন্ন রহস্যময় বস্তু দেখে।

ডাকোটা থেকে এই বিস্ময়কে দেখা গেছিল ঠিক আধ মিনিট। কিন্তু ওর্লি এয়ারপোর্টের কণ্ট্রোল টাওয়ারে ঝাড়া চারঘণ্টা ধরে আগন্তুক উড়নচাকি নিজের অস্তিত্ব জাহির করে গেছে ব্লিপ-ব্লিপ ধ্বনি আর আলোর নিশানার মধ্যে দিয়ে।

উড়নচাকিরা আকারে গোলাকার পিরিচের মত। পাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় চুরুট—গায়ে সারি সারি আলোর বিন্দু। 'ক্লোজ এনকাউণ্টার্স অফ দ্য ফার্স্ট কাইণ্ড' পর্যায়ে ঠিক এই ধরনের একটা বর্ণনা আছে। এরোপ্লেনের জানলার পাশ দিয়ে চকিতে দেখা দিয়ে উধাও হয়েছিল চুরুটের মত একটা বিশাল বস্তু—গায়ে সারবন্দী আলোকিত জানলা। তদন্তকারী এয়ারফোর্স অফিসার বস্তুটাকে উল্কাপিণ্ড আখ্যা দিয়ে ধামাচাপা দিয়েছিলেন।

'ক্লোজ এনকাউণ্টার্স অফ দ্য সেকেণ্ড কাইণ্ড' পর্যায়ের একটি ঘটনা রূপবিজ্ঞানের কাহিনীকারদের টনক নড়িয়ে দেয়।

কাহিনীটা 'ফ্লোরিডা স্কাউটমাস্টার' নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। 1952 সালের 19 আগস্ট স্কাউটমাস্টার' ভদ্রলোক তিনজন স্কাউটকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে সহসা দেখতে পেলেন একটা আলো।

আলোটা ঠিকরে আসছে অনেকগুলো তালগাছ যেখানে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে, তার ভেতর থেকে।

গাড়ি দাঁড় করালেন স্কাউটমাস্টার। ছেলে তিনটেকে বললেন, পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি না ফেরেন—তাহলে যেন খোঁজ নিতে যায়। বলে টর্চ হাতে ঢুকে গেলেন তাল গাছের জঙ্গলে। উনি ভেবেছিলেন, নিশ্চয় কোন উড়োজাহাজ বিকল হয়ে নেমে পড়েছে জঙ্গলের মধ্যে।

সঙ্গে একটা কাটারি এনেছিলেন স্কাউটমাস্টার। ঝোপ-কাটতে কাটতে একটু এগোতেই একটা উৎকট গন্ধ পেয়ে সচকিত হলেন—সেই সঙ্গে টের পেলেন, তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে।

আরও তিরিশ গজ এগোলেন ভদ্রলোক। জঙ্গলের মাঝখানে খোলা চত্বরটায় যখন পৌঁছোলেন, টেম্পারেচার তখন অসহ্য। ওপরে তাকাতেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল!

বিশাল একটা কালো বস্তু শূন্যে ভাসছে তাঁর দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন করে।

সচমকে পেছিয়ে এসে টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেলেন পিরিচের মত বস্তুটাকে। মসৃণ ধূসর পিরিচটা ভাসছে মাটি থেকে 30-40 ফুট ওপরে। তলার দিকে তোবড়ানো—ভেতরে ঢোকানো। ওপর দিকের ঠিক মাঝে রয়েছে একটা গম্বুজ। কিনারা রবাবর অনেকগুলো পাতলা পাখনার মত পাতের মাঝে মাঝে রয়েছে একটা করে জানলা।

এই পর্যন্ত ভাল করেই দেখেছিলেন স্কাউটমাস্টার। তার পরেই কানে শুনলেন, কোথায় যেন খুলে গেল একটা তৈল-নিষিক্ত দরজা, ছোট্ট একটা লাল বল বড় হতে হতে লাল গোলক হয়ে গিয়ে ধেয়ে এল তাঁকে লক্ষ্য করে। লালচে কুয়াশার মত মেঘে ঢেকে গেলেন নিমেষের মধ্যে। জ্ঞান হারালেন।

ছেলে তিনটে দূর থেকে দেখেছিল তাঁর টর্চের আলো ফোকাস মারছে ওপর দিকে। আচমকা তেড়ে এল একটা লাল গোলক। কানে শুনল, ধপাস করে পড়ে গেলেন স্কাউটমাস্টার।

গাড়ি থেকেই টেনে দৌড় দিল তিন স্কাউট—থামল সবচেয়ে কাছের খামারবাড়িতে।

যথাসময়ে এলেন শেরিফ আর পুলিশ। হতচেতন স্কাউটমাস্টার জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, যা দেখেছেন, যা শুনেছেন। আরও দেখালেন, ঝলসে গেছে মাথার চুল, ফোস্কা পড়েছে হাতে আর বাহুতে, পুড়ে গেছে মাথার টুপি।

ঝলসানি বা ফোস্কার কারণটা কেউ বলতে পারেননি। তবে টুপিতে অজস্র ছোট ফুটো দেখা গেছিল—ঠিক যেন

বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে টুপির কাপড়? অস্ট্রেলিয়ার কলাবনে আর নলখাগড়া বনে নেমেছিল উড়ন চাকি। কলাগাছ আর নলখাগড়া এমন ভাবে পিষে পাকসাট খেয়েছে যে দেখলেই মনে হয় একটা ঘুরন্ত বস্তু এদের ওপর চেপে বসেছিল। ঝলসে গেছিল মাটি। তলায় পাওয়া গেছিল তিনটে স্ট্যাণ্ডের দাগ—যার ওপর দাঁড়িয়েছিল উড়ন চাকিরা (19 জানুয়ারি, 1966)।

'ক্লোজ এনকাউণ্টার্স অফ দ্য থার্ড কাইণ্ড' কি রকম হতে পারে। তার নমুনা অনেকেই দেখেছে স্টিভেন স্পিলবার্জের এই নামে বিশ্ববিখ্যাত সিনেমায়। এ রকম নাম কেন দেওয়া হল সিনেমাটার, এ মানেটাও নিশ্চয় এখন বোঝা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যাক। উড়ন চাকির আরোহীদের দেখতে পাওয়ার প্রথম ঘটনাটা ঘটে 1947য়ের 23 জুলাই—ব্রেজিলে। জমি জরীপ করছিলেন হিগিন্স নামে এক ভদ্রলোক। আচমকা কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম তীব্র হুইসল ধ্বনিতে। মাথা তুলতেই দেখেন, একটা বিশাল থালার মত বস্তু মাটিতে নামছে। ব্যাস প্রায় 150 ফুট। সাদাটে ধূসর ধাতু দিয়ে গড়া। তিন ফুট চওড়া বলয় ঘিরে রয়েছে চারধারে। বাঁকা পা।

এই দেখেই জমি জরীপকারী অন্য লোকেরা চম্পট দেয়। একা দাঁড়িয়ে থাকেন হিগিন্স। তাঁর সামনে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তিন ভিনগ্রহী। প্রত্যেকেই সাত ফুট লম্বা। পরনে স্বচ্ছ পোশাক। মাথা আর গা ঢাকা রয়েছে এই পোশাকে। পিঠে রয়েছে 'হাওয়া দিয়ে ফোলানো রবারের থলি' আর 'ধাতুর বাক্স'। পোশাক দেখে মনে হল যেন রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি।

তিন ভিনগ্রহীকেই দেখতে এক রকম। বিশাল গোল-গোল চোখ মাথাও বিশাল, গোল এবং চুলের লেশটি নেই মাথাজোড়া টাকে। চক্ষুপল্লব নেই, দাড়ি নেই। অর্থাৎ, মুণ্ডগুলো একেবারেই চুলহীন। শরীর এই পৃথিবীর মানুষের মতই—তবে ঠ্যাংগুলো দেহের অনুপাতে বেখাপ্পা লম্বা। তিন জনের কে যে মেয়ে, আর কে যে ছেলে—তা বুঝতে পারেননি হিগিন্স। তবে তিনজনকেই ভারি সুন্দর বলে মনে হয়েছে।

তিনজনের একজন একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আটটা ফুটো করেছিল। অর্থাৎ, এমনই একটা সৌরজগৎ যেখানে গ্রহের সংখ্যা সাত। একেবারে বাইরের গ্রহটার দিকে কাঠি দিয়ে দেখিয়েছিল একটা শব্দ—ORQUE। উড়ন চাকি অনুরাগীরা এই শব্দের মানে দাঁড় করিয়েছেন ইউরেনাস। তিন ভিনগ্রহীর আগমন ইউরেনাস থেকে।

হিগিন্সকে মহাকাশযানে তোলবার চেষ্টা করেছিল বিদঘুটে প্রাণীগুলো, কিন্তু পারেনি। সরে পড়ে হিগিন্স। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে 30 মিনিট। তিন ভিনগ্রহী তখন মনের আনন্দে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করে লাফঝাঁপ করে এবং আকাশযানে চেপে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

এরকম ঘটনা আরও আছে। চুল খাড়া করে দেওয়ার মত, ঘটনা প্রতিটা। মঙ্গলগ্রহীরা (চার ফুট বাঁটকুল) —পরিষ্কার ইংরেজীতে যুক্তরাষ্ট্রের নিওয়ার্ক উপত্যকায়, এমন খবরও লিপিবদ্ধ হয়েছে—এসেছিল থলি ভর্তি সার নিয়ে যেতে। মঙ্গলগ্রহে চাষবাসের বড় অসুবিধে!

আর এক গ্রহের প্রাণীরা মানুষের চুল দাড়ি উপড়ে নিয়ে গেছে নিজেদের দেহে এই আহামরি বস্তুটা গজায় না বলে—এমন চমকপ্রদ কাহিনীও সংকলিত হয়েছে 'ক্লোজ এনকাউণ্টার্স অফ দ্য ফোর্থ কাইণ্ড' শ্রেণীতে। লোকটার নাম কার্লোজ আলবার্তো ডায়াজ। বয়স 28। নিবাস আর্জেণ্টিনায়। ভোরের দিকে কাজের জায়গা থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময়ে আচম্বিতে একটা অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলকে তার চোখে ধাঁধা লেগে যায়। জায়গাটা রেলের মালপত্র রাখার চত্বরে।

কার্লোজ চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে অনেক পরে। তখন কিন্তু সারা দেহ অবশ হয়ে গেছে—ঠিক যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কানে ভেসে আসছে বিরামবিহীন গুন্-গুন্ শব্দ। তার পরেই শূন্যে ভেসে ওঠে কার্লোজের বপু। গুন্-গুন্ শব্দটাই যেন বাতাসে ভর করে ওকে শূন্য পথে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ভয়ের চোটেই হোক কি অন্য কারণে হোক, কার্লোজ এরপর আর সজ্ঞানে থাকতে পারেনি।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, কার্লোজ দেখল, সে শুয়ে রয়েছে মসৃণ চকচকে গোলকের মধ্যে। কোন আসবাব নেই সেখানে। গোলকটা চওড়ায় আট ফুট, উচ্চতায় দশ ফুট। তিনজন ভিনগ্রহী ঢুকল এই গোল ঘরে। অদ্ভুত হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া এবং টানাটানি করতে লাগল কার্লোজের লম্বা লম্বা চুল। কয়েক মুঠো চুল উপড়েও নিল। কার্লোজের কিন্তু একদম ব্যথা লাগল না। ব্যথা না লাগার কারণ, অদ্ভুত ভাবে চুলের গোড়া শুদ্ধ উপড়ে আনা হচ্ছিল—একেবারে আস্ত অবস্থায়।

তিন ভিনগ্রহীর মাথার সাইজ মানুষের মাথার সাইজের অর্ধেক। এবং কারও মাথাতেই এক গাছি চুলও নেই!

মুখের রঙ শ্যাওলা সবুজ। বৈচিত্র্যহীন। অর্থাৎ, মুখগুলোয় চোখ, নাক, মুখবিবর আর কান নেই।

মাথায় প্রত্যেকেই প্রায় 5 ফুট 7 ইঞ্চি লম্বা। ছিপছিপে অঙ্গে নরম, ফিকে, ঘি রঙের 'রবারের' পরিচ্ছদ। মাথার চুল উপড়ে আনার সময়ে মহাউল্লাসে নাচানাচি করেছে তিন-জনেই। তারপর যখন কার্লোজের বুকের চল উপড়ানো আরম্ভ হল—ফের জ্ঞান হারায় বেচারী।

ঘণ্টা কয়েক পরে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল চড়া রোদ মুখে

পড়ায়। শুয়ে আছে মাঠের ওপর। পাশেই নিজের ব্যাগ। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখেছিল, খোবলা খোবলা জায়গায় চুল নেই।

পরে 46 ডাক্তার পরীক্ষা করে কার্লোজের মাথা। চুল তোলা হয়েছে শেকড় সমেত—আশপাশের ক্যাপিলারি টিশু এক্কেবারে পরিষ্কার। কিভাবে যে তা সম্ভব, তা মাথায় ঢোকেনি কারোরই।

এ ঘটনা ঘটে 1975রের নভেম্বরে। ইতিবৃত্ত প্রকাশ পায় 'ফ্লাইং সসার রিভিউ' সংকলনে (পৃষ্ঠা 21-39)।

চোখের ভুল না বাস্তব ?

উড়ন চাকিদের এত ঘটনার সব কিছুরই মূলে একটা-না-একটা প্রাকৃতিক কারণ আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকরা।

জ্যাকুইস ভ্যালী শুধু উড়ন চাকি বিশেষজ্ঞই নন, পেশায় তিনি কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক। 'পাশ পোর্ট টু ম্যাগোনিয়া' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, পৌরাণিক কিংবদন্তীগুলোর সঙ্গে একালের উড়ন চাকিদের সাদৃশ্য আছে। ভ্যালীর মতে মানুষ কল্পনাপ্রবণ। কিংবদন্তীর কল্পনায় জীবন চালিত হয়। নিজের এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানান ধারণা ক্রমাগত মনের মধ্যে রূপ নিচ্ছে কল্পনার ভিয়ানে।

কিন্তু বড় রহস্যটা এই : মনের মধ্যে এই রূপ পরিগ্রহ বাইরে থেকে ভিনগ্রহীদের কারসাজিতে হচ্ছে না তো ?

মনোবিজ্ঞানী কার্ল জি ইয়াং বলেছেন, উড়ন চাকিরা মানুষদের মনের ভয় আর আকাঙ্ক্ষার বাইরে প্রক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি—অজানা জগতে মানসিক বিচরণের প্রয়াস।

দুই বিজ্ঞানীর অভিমত মোটামুটি একরকম মনে হলেও ভ্যালী কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উড়নচাকির অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন এই হিসেবে যে উড়ন চাকির প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিশ্চয়। খুব কাছেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি পাল্টে যাওয়ায় তাঁদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। 1978য়ের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'ফেট' পত্রিকায় তিনি এই মত প্রকাশ করেন।

যাই হোক মানুষের মনে নিশ্চয় সন্দেশের ছাঁচের মত একটা কল্পনার ছাঁচ আছে—যা থেকে এই ধরনের কল্পনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কিন্তু এই জাতীয় 'প্যারানরম্যাল' থিওরী দিয়ে বহু অব্যাখ্যাত রহস্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা তো হচ্ছে না।

অ-পার্থিব সম্পর্ক

অন্য গ্রহ থেকে নিয়মিত দর্শনার্থীরা আসছে সবুজ গ্রহ এই পৃথিবীতে। এই বিশ্বাস অন্ততঃ বিজ্ঞানীদের মনে নেই। তাঁরা বলেন, এ ধরনের আসা যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী অবশ্য একথাও বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ কোটি ছায়াপথের কোথাও না কোথাও উন্নত সভ্যতা নিশ্চয় বিরাজমান।

আমাদের এই ছায়াপথেই রয়েছে বোধ হয় 200 বিলিয়ন নক্ষত্র। কার্ল স্যাগান হিসেব করে বলেছেন, দশলক্ষ সভ্যতাকে অবশ্যই আশা করা যায় নানা গ্রন্থে।

তাহলে কেন উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই বিজ্ঞানীরা মানতে চান না যে ভিনগ্রহীরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে পৃথিবীতে ?

একটা কারণ এইঃ বছর তিরিশ হল রেডিও মারফৎ আমাদের অস্তিত্ব জাহির করছি বাইরের বিশ্বে। আমরা থাকি তো ছায়াপথের কিনারায়। সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীও হয়তো আছে কয়েকশ আলোকবর্ষ দূরে। অতদূরে খবর যাবে। তবে তারা রওনা হবে এবং আসতে সময় লাগে না ? উঠল বাই তো কটক যাই—এ কি সেই ব্যাপার ?

আরও কারণ আছে। সভ্যতার মাপকাঠিতে আমরা বলতে গেলে আদিম অবস্থায় আছি। অতি উন্নত সভ্য প্রাণীদের বয়ে গেছে এত মেহনৎ করে এই আদিম গ্রহে বারবার হাওয়া খাওয়ার।

বিজ্ঞানীদের অবিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কারণটা কার্ল স্যাগ্যানের কথায় সুস্পষ্ট হয়েছে। তাঁর মতে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য প্রাণীরা মানুষের মতই দেখতে হবে এমন ধারণা আমাদের কাটছাঁট কল্পনাতেই সম্ভব। তাদের আসা-যাওয়াটাও মনে হবে যেন ম্যাজিকের মত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা যা বলছেন, সবই যেন তাঁদের পার্থিব ধ্যান-ধারণার ওপর বিপুল পরিমাণে রঙ চড়ানোর ব্যাপার। স্যাগান সাফ বলে দিয়েছেন, সায়ান্স ফিকশন যাঁরা লেখেন তাঁরাও নিশ্চয় মেনে নেবেন না যে ভিনগ্রহীরা দেখতে হবে প্রায় পৃথিবীর মানুষের মত। তাদের আকৃতি যে কি হতে পারে—তা একেবারেই আমাদের কল্পনাতীত। সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনাগুলো নিশ্চয় নির্জলা সত্যি নয়।

তাহা মিথ্যেও নয়—পক্ষান্তরে গলাবাজি করছেন উড়ন চাকি বিশ্বাসীরা। ভিনগ্রহীদের আসা-যাওয়া এবং দর্শন দিয়েও উধাও হয়ে যাওয়া কি ম্যাজিকের মতই ঘটে যাচ্ছে না ?

আগামী সংখ্যায়

[**আধিব্যাধির প্রতিরোধ এবং পলায়ন রহস্য**]

ইলেকট্রনিক্স-ক্যুইজ Part IX বিপ্লব ব্যানার্জী

1. Piezoelectric Effect গুণসম্পন্ন তিনটি কৃষ্টালের নাম কর।

2. Intrinsic সিলিকন ও জার্মেনিয়ামকে Doping জন্য (ক) Pure Impurities, (খ) Impure Impurities ব্যবহার করা হয়।

3. তরল সিলিকনে একটি ছোট সিলিকন কৃষ্টাল (ক) ভাসমান অবস্থায় থাকে, (খ) সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে, (খ) অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে, (ঘ) তরল সিলিকনে ছোট সিলিকন কৃষ্টালটি একদম গুলিয়া বা মিশিয়া যায়।

4. Resistor, Capacitor, Inductor, Transistor এই চারটির মধ্যে Active device কোনটি?

5. একটি 1000 PF মানের Capacitor এর উভয় দিকে যে তার বা lead বাহির হইয়া আছে তাহাদের প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য half inch হইলে উক্ত Capacitor-টির Resonant Frequency কত হইবে?

6. চারটি Capacitor যথাক্রমে (ক) Tantalum, (খ) Steroflex, (গ) Poly Carbonate এবং (ঘ) Paper type-এর হইয়া থাকিলে চারটি Capacitor এর মধ্যে কোনটির Leakage current সর্বাপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

7. Silicon ও Carborundum এই দুইটির মধ্যে কার Hardness কম?

8. Minus 273° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটা Intrinsic Silicon Crystal (ক) সম্পূর্ণ Conductor এর মতো ব্যবহার করে, (খ) Perfect Insulator-এর মতো ব্যবহার করে, (গ) Semiconductor-এর মতো ব্যবহার করে।

9. A ও B দুইটি একই শক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ একই wattage-এর Transformer। এখন A transformerটি 18000 Volt, 50 Hz এবং B transformerটি 18000 Volt, 15625 Hz-এ কাজ করিতেছে। তাহা হইলে, (ক) A ও B-র আকৃতি বা Size পরস্পর সমান, (খ) A-র Size B অপেক্ষা ছোট, (গ) A-র Size B অপেক্ষা বড়।

10. একটি doped Semiconductor-এর Resistanceকে বলে——

11. 25°C তাপমাত্রায় একটি Silicon Diode-এর Barrier Potential আনুমানিক 0·7 Volt হইলে 0°C তাপমাত্রায় উহার Barrier Potential হইবে আনুমানিক ——Volt.

12. 100°C তাপমাত্রায় একটি Silicon Diode-এর Barrier Potential হইবে আনুমানিক——Volt.

13. আমরা সাদা-কালো 51cm T.V. Set-এ যে Picture Tube ব্যবহার করি তা সাধারণতঃ——type-এর হয় এবং যার Focusing Method— আর Deflection Method——হওয়া উচিৎ।

14. Intrinisic সিলিকন ও জার্মেনিয়ামকে p-type ও n-type করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অনুপাতের কতকগুলি p-type ও n-type অশুদ্ধি বা Dopant মিশ্রণ করার প্রয়োজন হয়। এখন নিচের উল্লিখিত Dopant গুলি হইতে কোনটি p-type Dopant এবং কোনটি n-type Dopant হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা খুঁজে বার কর এবং এর মধ্যে কোন্ Dopantটি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?

(a) Antimony (SB), (b Boron (B), (c) Phosphorus (P), (d) Gallium (Ga), (e) Aluminium (Al), (f) Arsence (As), (g) Indium (In).

15. Leo——নামে এক জাপানের বিজ্ঞানী——সালে——Diode আবিষ্কার করেন।

16 স্ত্রী মশার যে ভনভনানি আমাদের প্রত্যেকের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করে তাহা সাধারণতঃ (ক) Ultra-sound wave, (খ) Audiowave, (গ) Microwave range-এর হইয়া থাকে।

17. BCD, TWT, CW এই তিনটির কোনটি কি অর্থ প্রকাশ করে?

18. MNOS device বলিতে কি বুঝ?

19. VLSI =?

20. 1986 সালে যে VLSI Chip তৈয়ারি হইয়াছিল তাহার Gate size——Number of Gates per chip——, Number of Transistors per chip——আর Gate speed ছিল——.

21. EPROM =?

22. 65 watt, 22 Volt, 50 Hz rating-এর একটি Ceiling Fanকে যথাক্রমে (ক) 220 Volt, 400 Hz, (খ) 220 Volt, 40 Hz, (গ) 220 Volt, 60 Hz, (ঘ) 220 Volt, 4 Kilo Hertz এ চালানোর চেষ্টা করা হইলে কোন্ ক্ষেত্রে Fanটির speed সর্বাপেক্ষা বেশি হইবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে Fanটির speed সর্বাপেক্ষা কম হইবে?

23. বাজারী চালু LCD digital wrist watch গুলির crystal frequency সাধারণতঃ কত হইয়া থাকে ?

24. সনাতন Multielement folded dipole antenna-র পরিবর্তে একটি জীবন্ত কলাগাছের একটি পাতার ডগায় একটি তামার তার বাঁধিয়া তারটির অপর প্রান্ত T.V Set-এর Antenna Socket-এ গুঁজিয়া দিয়া T.V-র ছবি দেখা (ক) সম্পূর্ণ সম্ভব, (খ) পুরাপুরি অসম্ভব (গ) বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাধারার প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে একদম উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

25. Ferrite Core, Silicon Iron Core এবং পাতি Iron Core এই তিনটির মধ্যে কার Permeability বেশি ?

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ এর উত্তর

1. Quartz, Rochelle salts, Tourmaline.

2. (ক), 3. (ক), 4. Transistor, 5. [35·6 Mega Hertz], 6. (ক), 7. Silicon, 8. (খ), 9. (গ), 10. Bulk resistance, 11. [0·75 volt], 12. [0·55 volt], 13. [500 CIP], Electrostatic, Magnetic, 14. p-type [(e), (d), (d), (g)], n-type [(c), (f), (a)], Gallium (Ga) সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

15. [Esaki, 1958, Tunnel], 16. (খ), 17. BCD = Binary Coded Decimal, TWT = Travelling wave Tube, CW = Continuous Wave.

18. MNOS device = Metal Nitride Oxide Silicon device.

19. VLSI = Very Large Scale Integration.

20. 0·7 micrometer, 1·5 Lakhs, 10 Lakhs, 0·6 nanosecond.

21. EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory.

22. [(খ), (ঘ)], 23. [32·768 Kilo Hertz], 24. (গ), 25. Ferrite Core.

17, নং যাদব ঘোষ রোড, কলিকাতা-61

গ্রামীণ

এনেছে অপরূপ রুচিসম্মত বস্ত্রসম্ভার

১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৮ পর্যন্ত

—বিশেষ রিবেট—

সুতি খাদি	— ৩৫%	রীল্ড সিল্ক	— ২০%
স্পান সিল্ক	— ৩০%	পলিবস্ত্র	— ৪০%

আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ি, আধুনিক পলিবস্ত্র এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সুতি, রেশম ও পশম খাদির রঙ, রুচি ও ডিজাইনের মনোরমা পসরা।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

(পঃ বঃ সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

২, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

[34 পৃষ্ঠার পর]

ফ্লাড লাইটের আলো এড়িয়ে প্রাণপণে ছুটলাম সমুদ্রের দিকে, যেদিকে আমাদের নৌকো বাঁধা রয়েছে। রাস্তা দেখানোর কাজে আমাদের পথপ্রদর্শক ছেবর। ছেবরের ক্ষমতা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। ও এমনভাবে ঝোপজঙ্গল খানাখন্দ পেরিয়ে ছুটছে, যেন এই দ্বীপেই ওর ঘরবাড়ি। বহুদিন ধরে অন্তরঙ্গভাবে এই দ্বীপের সঙ্গেই ওর মেলামেশা। অথচ এই দ্বীপের সঙ্গে ওর পরিচয় আমাদের কারো চেয়েই বেশি নয়। ছেবরকে দেখে মানুষের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রথম আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এতসব চিন্তা করার সময় ছিল না। বিশেষত—যখন একটু পরেই বুঝতে পারলাম, শত্রুপক্ষের জিপ একেবারে আমাদের কাছে—মাত্র দু'শো মিটারের মধ্যে।

জিপের ফ্লাড লাইটের আলোয় এবার আমাদের পুরো দলটা একেবারে উদ্ভাসিত। জিপের লোকগুলোকে অন্ধকারের ভেতরেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরা বন্দুক বের করছে। শত্রুপক্ষের কবল থেকে আর আমাদের রক্ষা নেই। মৃত্যু একেবারে অবধারিত। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে বাবা মা আর পাপিয়ার মুখ মনে পড়ল। মনে হলো আন্দামানের কোন এক অজানা দ্বীপে—যার সঙ্গে পাপিয়া রুপাই আর

পরমুহূর্তেই ছেবর লোকটার উপরে ঝাপিয়ে পড়ল।

আমার নাম জড়িয়ে আছে, এমন একটা জায়গায় আমাদের মৃতদেহ পড়ে থাকবে। ভবিষ্যতে কোনো জাহাজ দূর থেকে দেখতে পেয়ে যদি এই দ্বীপে আসে তবেই—

আচমকা ছেবর চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, গুলি চালাচ্ছে—'

ট্র···র···র...গ্রুম...গ্রুম...গ্রুম....

আমরা সবাই উপুড় হয়ে মাটির সঙ্গে বুক লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। শংকরকাকার বন্দুকটা কিভাবে যেন জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। সৃজনকাকার একটা রিভলভারে কি আর হবে! একটু পরেই দেখতে পেলাম, চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে ওরা। ওদের হাতে বন্দী হলাম আমরা। আমরা মানে আমি সৃজনকাকা ও শংকরকাকা। তাছাড়া শ্রীবাস্তবচাচা তো আছেনই।

কিন্তু ছেবর গেল কোথায়? ছেবর তো আমাদের সঙ্গেই ছিল! সূর্য সোম ও তার দলবল যখন গুলি চালাতে শুরু করে, তারপর থেকেই ছেবরকে আমি দেখি নি। তবে কি ছেবর আমাদের সঙ্গে বুক পেতে মাটিতে শুয়ে পড়ে নি? নাকি ওদের গুলিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে সমুদ্রতীরের পড়ে আছে! ছেবরদার কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল।

অবশ্য এদিকে আমাদের অবস্থাই বা এমন কি ভালো! ছেবর না হয় বোমবেটেদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। আর আমাদের হয়তো এরা ফাঁসি দেবে। বোমবেটেরা যে কতখানি নিষ্ঠুর হয়, তা কে না জানে।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিঃ সূর্য সোম ও তাঁর দুই চীনা সহযোগী। তাছাড়া আরো প্রায় তিনচার জন রক্ষী। রক্ষীদের প্রত্যেকের হাতেই অটোম্যাটিক রাইফেল। একবার রাইফেল চালালে আমাদের মগজ ফুটো করে গুলি বেরিয়ে যেতে দু'সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগবে না।

মিঃ সোম কাকার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, 'কি মিঃ বোস। আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন তাই না। সঙ্গে দু'চারটে চুনোপুঁটি নিয়ে এসে ভেবেছেন, আমাদের গ্রেপ্তার করে মেনল্যাণ্ডে চালান দেবেন? হুঁ—'

কোনো উত্তর না দিয়ে কাকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম, কাকার চোয়ালের পেশীগুলো অসম্ভব শক্ত হয়ে উঠেছে! কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছেন।

এরপর সূর্য সোম নিজের দুই চীনা নাকি জাপানী সহযোগীর সঙ্গে ইংরেজিতে কি সব যেন আলোচনা করলেন। ওদের আলোচনা থেকে বুঝলাম, বেঁটে থ্যাবড়া-মুখ কুঁতকুঁতে চোখের লোকটার নাম মিঃ লী আর লম্বা কিছুটা কুঁজো লোকটা মিঃ সুজুকি। দুজনেরই বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

মিঃ লী'র নির্দেশ মতো একজন রক্ষী এসে আমাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মিঃ সোম কড়া গলায় হুকুম দিলেন, 'চলুন, আমার পেছনে পেছনে আসুন। একদম চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। যদি একটুও বেচাল দেখি তো রক্ষীরা আপনাদের মগজ ফুটো করে ঘিলু বের করে দেবে। বুঝেছেন?'

ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ঐ রক্ষীগুলোর হাতে উদ্যত রাইফেল। একটুও নামায় নি। দুরু দুরু বুকে সামনের দিকে এগোলাম আমরা। সামনে মিঃ সোম। মিঃ লী ও মিঃ সুজুকি। আমাদের পেছনে রক্ষীবাহিনী।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে এলাম কাঁটাতার দেওয়া একটা ব্যারাকের কাছে। এখানেই আগে বন্দী ছিলেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

হাতকড়া খুলে আমাদের চারজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল রক্ষীরা।

যাবার আগে মিঃ সোম বাঁকা হাসি হেসে বললেন, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই আজ আর কিছু করলাম না। আমাদের কথা মতো কাজ না করলে কাল আপনাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেব। তারপর দেখব আপনারা কি করেন? ও, কে, গুড নাইট। কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

ঘরের ভেতরে ঢুকে গুছিয়ে না বসতেই দরজায় তালা লাগাবার আওয়াজ পেলাম। এবার আমরা সবাই মিলে বন্দী হলাম। কিন্তু মুক্তি কী পাব? আসি তো কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না। [ক্রমশঃ]

মঙ্গল গ্রহের মলিকিউলিক্সার

উজ্জ্বল আচার্য

সেদিন বিকালে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। আনমনে চলতে চলতে কখন সন্ধ্যে হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। এবার ফেরার পালা। জঙ্গলটা পেরোচ্ছি, হঠাই মনে হলো সামনে কিছু একটা নড়ছে। কি বাবা কোন বড় জন্তু টন্তু নয়তো। হঠাৎ নজরে এলো কিছু একটা চিক্ চিক্ করছে। দৌড়তে ইচ্ছা হলো কিন্তু পারলাম না! মনে হলো বস্তুটি আমাকে তার দিকে টানছে। আমি না এগিয়ে পারলাম না। বাপরে এটা কি জিনিস, না ঘর, না গোল কোন মেসিন। উপরের দিকটা গোলাকার কিন্তু নীচেরটা সমতল একটা বস্তু। টিনের না অ্যালুমিনিয়ামের ঠাহর করতে যাচ্ছি হঠাৎ কপাটের মত কিছু একটা খুলল মনে হল। ভিতরে ঢুকতে বাধ্য হলাম। বাপরে এগুলো কি মানুষ না অন্য কোন প্রাণী। বইয়ে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে ভিনগ্রহী সম্বন্ধে যে সব গল্প পড়ি ঠিক সেই রকম। উপরের ও নীচের অংশ আয়তাকার। মাঝের অংশ অর্থাৎ পেট গোলাকার। দাঁতগুলো খুব বড় আর ধারাল, নীল রঙের। চোখ দুটি গাঢ় নীল, হাতের নখগুলো বাঁকা তরোয়ালের মতো। হাত, পা গুলো আমাদের তুলনায় খুবই ছোট। আমি দেখলাম এখানে চার পাঁচটা এরকম প্রাণী বা মানুষ আছে। আমি আপাততঃ মানুষই বলি আপনারা না হয় অন্য কিছু বলবেন। লোকটা কি একটা সুইচে টিপ দিল দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর একটা সুইচে টিপ দিতেই যন্ত্রটি সোঁ সোঁ করে আকাশ পথে উড়তে লাগল।

এরা আমায় কোথায় নিয়ে যায়? কী চায় এরা? একটা লোক আমাকে কি যেন জিজ্ঞেস করল। কিছুই বুঝলাম না। মনে হলো কোন কিছু বাদ্য বাজানো হচ্ছে। অন্য একজন লোক একটা সুইচ অন করল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটা পর্দায় ফুটে উঠল এই লেখাটি তখন—

বাংলা	ইংরেজী
Bengali	English

লোকটি আমায় জিজ্ঞেস করল—

হু আর ইউ?—তুমি কে?

আমি নিজের নাম, ঠিকানা বললাম।

আমিও একই কথা জিজ্ঞেস করায় লোকটি বলল—আমরা মঙ্গল গ্রহের লোক। মঙ্গল গ্রহের রাজা মলিকিউলিক্সার আমাদের আদেশ দিয়েছেন পৃথিবীর মানুষ নিয়ে যাবার জন্য। তখন বুঝলাম মঙ্গল গ্রহে তাহলে মানুষ আছে। তবে কল্পবিজ্ঞানের লেখাই ঠিক। তারা নিজেদের মধ্যে কিসব বলাবলি করতে লাগল। আমি মনে হয় আস্তে আস্তে কালা হয়ে গেলাম, কেননা তাদের কোন কথাই শুনতে পাচ্ছি না। এমন সময় যন্ত্রটি এক জায়গায় থামল। যেখানে দু'একজন আরও মঙ্গল গ্রহের লোক যন্ত্রটিতে উঠল। সেখানে আমি কয়েকজন পৃথিবীর মানুষও দেখতে পেলাম। চিৎকার করে ডাকলাম কিন্তু তারা শুনতে পেল বলে মনে হলো না।

তখন লোকটি আমার হাতে একটা যন্ত্র লাগাল আর বলল—এটা হলো তোমাদের পৃথিবী উপগ্রহ চন্দ্র। এখানে পাশাপাশি কারও সঙ্গে কথা বললে এ যন্ত্র না লাগান পর্যন্ত শোনা যাবে না।

তখন আমার মনে হলো যে শব্দ মাধ্যম ছাড়া চলাচল করতে পারে না তারই জন্য ওই মানুষগুলো আমার ডাক শুনতে পায় নি। আমিও তাই কালা হয়েছিলাম।

মঙ্গল গ্রহের বিজ্ঞানীরা-এরও সমাধান করেছেন এই যন্ত্রের সাহায্যে।

লোকটি বলল এবার আমরা শুক্র গ্রহের উপর দিয়ে যাচ্ছি। আর কিছুক্ষণ পরেই মংগল গ্রহে পৌঁছব। শুক্র গ্রহের স্টেশনেও যন্ত্রটি থামল কিন্তু কেউ ওঠানামা করল না।

* • *

এবার তোমাকে মলিকিউসিক্সারের কাছে নিয়ে যাব। লোকটি বলল। যাবার জনা আমরা একটা চারকোণা যন্ত্রে উঠে বসলাম সংগে সঙ্গে একটা ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। উপরে নানা ভাষায় মলিকিউলিক্সার নাম লেখা।

বাপরে চারিদিকে কত যন্ত্র। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গুণে শেষ করা যাবে না। পৃথিবীর দু একটি রোবটও এদের মধ্যে আছে। এমন সময় চোখ ঝলসানো বিকট পোশাক পরা মলিকিউলিক্সার এল।

মলি কিউলিক্সার বলল—'শোন এরা আমারই নির্দেশে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর মানুষগুলো এখনও বিশ্বাস করতে চায় না যে ভিনগ্রহে প্রাণী আছে। শুধু মঙ্গলগ্রহেই নয়, বৃহস্পতি, ইউরেনাস প্রভৃতি সব গ্রহেই প্রাণীরা আছে। এই যন্ত্রটার নাম Asteraxation। এই যন্ত্রদ্বারা পৃথিবী সহ সমস্ত গ্রহকেই দেখা যায়।' মলি-কিউলিক্সার সুইচ টিপল। আর সঙ্গে সংগে এক একটা করে ছবি একটা পর্দায় ফুটে উঠতে লাগল। আমাদের পৃথিবীকেও দেখা গেল ঠিক ভূ-গোলকের মত।

'তোমাদের বেতার সংকেত কদিন হলো পেয়েছি। আর কদিন পরেই হয়ত তোমরা আমাদের বেতার সংকেত পাবে। এর আগে তিনবার আমি উড়ন্ত চাকী করে পৃথিবীতে লোক পাঠিয়েছি।'

এতক্ষণে আমি বললাম, 'আমার কথা কি পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করবে?'

'কেন করবে না? আমি তোমাকে একটা যন্ত্র দেব। যার সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের আকৃতি ও এখানকার লোকদের ছবি তুমি পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে পারবে! তাছাড়া পৃথিবীর মানুষগুলি খুব নিষ্ঠুর। তারা নিজেরা অস্ত্র তৈরি করছে নিজেদের ধ্বংসের জন্য। তবে আমাদের নিকট সে যন্ত্রও আছে, যার দ্বারা সমস্ত অস্ত্রই অকেজো করে দেওয়া যায়। এখনও যদি তারা পারস্পরিক অস্ত্র তৈরি বন্ধ না করে, তবে আমাদের সেই ব্যবস্থাই করতে হবে!'

* * *

এরপর সেই লোকটি উড়ন্ত চাকীতে করে আমাকে সেই মঙ্গলেই নামিয়ে দিয়ে গেল।

আপনারা/ তোমরা যদি আমার কাছে সেই যন্ত্রটি দেখতে চান / চাও তবে কিন্তু দেখাতে পারব না। কেননা সেটি আনতে একদমই ভুলে গেছি।

দিনহাটা, কোচবিহার।

আততায়ী

মৌমিতা সাহা

ভোর চারটের সময় ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। এই শীতের রাতে বিছানায় লেপ ছেড়ে উঠতে কারো ভালো লাগে ?

রণ্টু অ্যালার্ম শুনেও ভালো করে গায়ে লেপটাকে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো ! পাশ ফিরে শুলেও রণ্টু জানে মা তাকে এখনই ডাকবেই, উঠতে তাকে হবেই পড়ার জন্য।

কিন্তু নাঃ, প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল অ্যালার্ম বেজেছে ; এখনও মা কিম্বা ভাই তাকে ডাকলো না। রণ্টুর ঠিক ভোর চারটেয় উঠে উঠে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে শুয়ে থাকলেও তার আর ঘুম আসে না

রণ্টু এখন বাঁকুড়ার খ্রীস্টান স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। কাজেই, পড়ার জন্য মাকেই ভাবতে হয় বেশি ! এটা অবশ্য মায়ের ধারণা। মা বললেন "রণ্টু তোর জন্য আমাকে পাগল হতে হবে। নিজের পড়ার দায়িত্বটা এখনও বুঝতে পারলি না ? আর দুদিন পরে মাধ্যমিক দিবি। কি করে পরীক্ষা দিবি বলতো ?"

রণ্টু বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে, "কি ব্যাপার ; মা আজকে আমাকে ডাকলো না কেন ? মা হয়তো ভাবছে দেখি রণ্টু কি করে ? আচ্ছা, ও দেখিয়ে দেবে ওর পড়ার জন্য ও কতটা সজাগ।"

এই সব ভেবে উঠে পড়ল পড়তে। ওর পড়ার শব্দে মায়ের ঘুম ভাঙ্গল।

রণ্টুকে মা বললেন, "কিরে, কটা বাজল ? আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।"

রণ্টু বলল, "চারটে পঁচিশ।"

রণ্টুর ভাই সণ্টু ক্লাস সিক্সে পড়ে। তাই এখন ওর পড়ার জোর বেশি নেই। ওর বাবা একজন পোস্টাল সুপারইন্‌টেনডেণ্ট্‌। তিনি মাসে মাসে বাড়ি আসেন। রণ্টুরা বাঁকুড়াতে থাকে। এখানে ঠাকুমা, মা ভাই আর এক পিসতুতো ভাই অমল থাকে। অমল ক্লাস সেভেনে পড়ে।

সকালে মা রণ্টুকে আজ খুবই ভালো বলছে। এই ভোরে নিজের দায়িত্বে উঠার জন্য...

রণ্টুর ঠাকুরদার আমলে ওরা বিরাট জমিদার ছিল। তখন বাইরে থেকে অনেক লোকজন এখানে আসতেন বেড়াতে ও শিকারের জন্য। ঠাকুরদা শিকার করতে খুবই ভালো বাসতেন। সে জন্য অনেক লোকজন আসতো ঠাকুরদার সঙ্গে বড়ো বড়ো শিকার করতে যাবার জন্য। অনেক সময় নাকি ঠাকুরদাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, নিয়ে যেত বড় বড় বনে ; বাঘ, হরিণ, চিতা শিকারের জন্য। এখনও ওদের বাড়িতে বন্দুক আছে। কিন্তু এখন সেটা পড়েই আছে। বাবার এসব দিকে মনটন নেই। রণ্টু যদিও শিকারে যেতে ভালো-বাসে, কিন্তু এই মায়ের জন্যই সেটা সম্ভব হয়নি। ঠাকুমা বলেন, ঠাকুরদাদা নাকি খুব সুন্দর সুন্দর ছবিও আঁকতে পারতেন। অনেক ছবি নিজে হাতে এঁকেও ছিলেন।

সেগুলো নাকি তখন বাড়িতে সাজানো থাকতো। এখন সেসব নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ঠাকুরদার জিনিসপত্রের সঙ্গেই ওগুলো পড়ে আছে।

রণ্টু কিন্তু ছবিগুলো এখনও দেখেনি। ঠাকুমা বলেছিলেন একবার বিষ্ণুপুরে না কোথায় যেন অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দিরের ছবি দাদু নিজে হাতে এঁকেছেন। সেই আঁকা তৈলচিত্রগুলো খুবই সুন্দর হয়েছিল বলে ঠাকুরদা আঁকা প্রদর্শনীতে ফার্স্ট প্রাইজও একবার পেয়েছিল। এসব রণ্টু শুনেছে তার ঠাকুমার মুখে। কিন্তু এখন নাকি ছবিগুলো কালো হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট কিছু বোঝাই যায় না। কোন মূর্তিটুর্তি দেখেও দাদু আঁকতে পারতেন খুবই সুন্দর করে। নানা ধরনের পশু পাখির ছবিও দাদু এঁকেছিলেন। ঠাকুমা এসব প্রায়ই বলতেন। রণ্টু তন্ময় হয়ে শুনতো। আর ভাবতো ইস্! এতো সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল? রণ্টু এক সময় ভাবে এ ছবিগুলো যদি আবার আগের মতো করা যেত তাহলে কি ভালোই না হোত।

সেদিন স্কুল থেকে এসেই রণ্টু ঠাকুমাকে বললো, 'ঠাকুমা, দেখিনা দাদুর ছবিগুলো।'

ঠাকুমা বললেন, "কি জানি ভাই এখন কোথায় আছে। আর তাছাড়া ওগুলো নিয়ে কিই বা করবি? সব একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।"

রণ্টু বলল "দেখাবে তো ঠাকুমা। আমি তোমার ছবিগুলোকে সব ভালো করে স্পষ্ট করে দেবো।"

ঠাকুমা রেগে রেগে বললেন, এখন কোথায় পাব বলতো? সেসব জিনিসগুলো পুরোন বাড়ির ঐ সামনের ঘরটাতে আছে তালা বন্ধ হয়ে। কাল দেখাবো"...

তার পরদিন সকালেই রণ্টুর জেদের জন্য ঠাকুমা তালা খুলে বিরাট বাক্সটা দেখিয়ে বললেন, "এই নে চাবি। এই বাক্সটা ভর্ত্তি আছে তোর দাদুর ছবিতে।"

রণ্টু দেখল, সত্যিই ছবিগুলো একেবারেই বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না। কিন্তু মনে আশার আলো জ্বলছে, কেননা বই এ পড়েছ হাইড্রোজেন পারক্সাইডের ক্ষমতা। ও আর দেরী না করে পুরনো বাক্সটা নিয়ে ওর পড়ার ঘরে গেল।

পুরোনো বাক্স দেখেই মা বললেন, "এটা নিয়ে এলি কেন? ওটাতে তোর দাদুর আঁকা ছবি টবি ছিল। আমি ওখানে রেখেছিলাম। ছবিগুলো তো নষ্ট হয়ে গেছে।"

রণ্টু বললো "দেখো না আমি কি করি। আমাকে এখন একেবারেই বিরক্ত ক'রো না।" এই বলেই সে তার পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

কিছুদিন আগেই রণ্টু বই-এ এবং স্কুলে স্যারের মুখে শুনেছিল, "পুরোনো ও বিবর্ণ তৈল চিত্রকে যদি হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ দ্বারা ধোয়া যায় তাহলে ঐ চিত্রের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসবে।" কাজেই ও ছবিগুলোর উপর হাইড্রোজেন পারক্সাইডের দ্রবণ প্রয়োগ করলো। আর সত্যিই ঐ কালো বিবর্ণ ছবিগুলো নিজেদের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে পেতে লাগল। সত্যি! দাদুর ড্রয়িং হাত কি দারুন ছিল। এই ছবিগুলো দেখেই রণ্টু তা বুঝতে পারলো। কত রকমের মন্দির, নানারকমের ফুল, বাঘ, হাতি, হরিণ, বুদ্ধদেবের কত অপূর্ব মূর্তি, অনেক দেবদেবীর ছবিও দাদু এঁকেছেন।

রণ্টু ভাবছে, দাদুর মতো আমি এগুলোকে অযত্নে রাখবো না। বেশ ভালো করে কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। তাহলে আর এগুলোতে বাতাসের হাইড্রোজেন সালফাইড ক্রিয়া করতে পারবে না, আর ছবিগুলোও বিবর্ণ হবে না।

আসলে দাদু যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন সেটাতে লেড যৌগের রং ছিল। বাতাসের হাইড্রোজেন সালফাইড ধীরে ধীরে লেডের সঙ্গে ক্রিয়া করে লেড সালফাইডে পরিণত হয়ে কালো হয়েছে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের দ্রবণ এই কালো কাগজে দেওয়াতে এটা সাদা হয়েছে। এবং ছবিগুলোও স্বাভাবিক রং ফিরে পেয়েছে। কালো লেড সালফাইড জারিত হয়ে সাদা লেড্ সালফেটে পরিণত হয় বলে এই রূপ রঙের পরিবর্তন ঘটে।

ছবিগুলোকে দেখতে দেখতে রণ্টু তন্ময় হয়ে গেছে। মা দরজায় নাড়া দিচ্ছেন। আর বলছেন, "এই রণ্টু এই বিকেলে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? সন্ধ্যে হয়ে গেছে।"

রণ্টু দরজা খুলে দাদুর ছবিগুলো মা, ঠাকুমাকে দেখাতেই ওরা সবাই অবাক হয়ে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠাকুমার মুখে চোখে আনন্দের হাসি উপচে পড়ছে। একটু পরেই ঠাকুমার মুখে চোখে আনন্দের অশ্রু দেখা দিল। ঠাকুমা বলল, "কি করে এটা করলি রে দাদু ভাই? তোর দাদু থাকলে যে কী খুশি হতো তা বলার নয়।"

রণ্টু বললো, "ঠাকুমা এই বিজ্ঞানের যুগে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

উল্টাডাঙ্গা, পি. টি. কিউ রার, নং-6, টাইপ-III কলি-67

জ্ঞান বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞান সঠিক ভাবে শিখতে হলে হাতে-কলমে কাজ করা চাই, চাই পরীক্ষাগারে সফল ব্যবহার। পুস্তক-ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই। স্কুল-কলেজে পরীক্ষাগারে ছেলে-মেয়েরা পাঠ্যসূচীর বাইরে কাজ করার সুযোগ পায় না। তাছাড়া, আর্থিক ও প্রশাসনিক কারণে তারা যে নিজে নিজে কিছু করবে তা প্রায় অসম্ভব। ইদানীং চারদিকে বিজ্ঞান ক্লাব জন্ম নিচ্ছে, উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা সেখানে মনমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে। পরীক্ষা করা, হাতে কলমে শেখার নির্দেশাত্মক বই "নিজে নিজে কর" প্রকাশ করে জয়ন্ত দত্ত যেমন খুদে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছেন, তেমনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সর্বমোট 73 টি মডেল বা এক্সপেরিমেন্টের সমাবেশ করা হয়েছে বই দুটিতে। এতে যেমন আছে সহজ ইলেকট্রনিক মডেল, তেমনি আছে হাতের কাছে লভ্য পদার্থ দিয়ে বানানো পরীক্ষা। পরীক্ষাগুলি বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি বুঝতে সাহায্য করে। শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য একদা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় সহজ পরীক্ষা লিখতেন, সে সব পরীক্ষার বেশ কিছু অংশ প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে! গোপালচন্দ্রের লেখার প্রসাদগুণে বইটিকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। প্রত্যেকটি মডেল তৈরি করতে কি কি লাগবে, তাদের কোথায় পাওয়া যাবে, দাম কত—সব বিশদভাবে দেওয়া আছে। এখন চাই ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহ, না হলে এমন একটি সুন্দর বই লেখার তাৎপর্য হারিয়ে যাবে। আজকাল চারিদিকে এমন একটি হাওয়া উঠেছে যাতে মনে হয় বই পড়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে জয়েন্ট এণ্ট্রান্সে সুযোগ পেলেই বিজ্ঞান শিক্ষার সার্থকতা হলো। পরীক্ষার গুরুত্ব এমনকি প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষাতেও হ্রাস পাচ্ছে। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা সমানতালে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা নেয়।

তাই এই বই দুটির বিপুল প্রচার প্রয়োজন। তার সঙ্গে চাই বইয়ের নির্দেশিকার ব্যবহারিক প্রয়োগ। বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। তবে ছোটদের বইয়ে আর একটু কম ছাপার ভুল থাকা উচিত। তাছাড়া অতো ইংরাজী শব্দের ব্যবহার কেন?

নিজে নিজে কর ॥ জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ॥ প্রতিটি ২০৲ টাকা

অপরাজিত বসু

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ॥ প্রতি খণ্ড দাম ১০৲

প্রতি খণ্ডে অর্দ্ধশত মডেলের নির্মাণ প্রণালী ও সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

পশ্চিমবঙ্গকে জানুন-১

আনন্দোচ্ছল ছুটির রমণীয় অভিজ্ঞতার জন্য চলুন

পশ্চিমবঙ্গ

চলুন, পাহাড়ে ঘুরে আসি

হিমালয়ের পাদদেশে ছবির মতো অপরূপ ডুয়ার্স—দেখে মন ভরবে। এছাড়া শৈলশহর দার্জিলিং কিংবা কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং নতুন শৈলাবাস মিরিক তো আছেই। মন চাইলে ট্রেকিং এবং অন্যান্য আনন্দেরও ভাগীদার হতে পারেন।

এবার চলুন সমুদ্র-সৈকতে

দীঘা এবং বকখালির স্বর্ণালী সমুদ্র-সৈকত সত্যিই অপূর্ব। কিংবা ডায়মণ্ডহারবারেও যেতে পারেন। মোহনার কাছে বলে এখানে গঙ্গার দিগন্ত-বিস্তারী রূপ সত্যিই দেখবার মত।

ঘন অরণ্য আর বন্য প্রাণী দেখতে চান

প্রথমে জলদাপাড়া চলুন এখানে দুর্লভ এক-শৃঙ্গ গণ্ডার দেখতে পাবেন। এরপর চলুন পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাসভূমি এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোহনা-অরণ্য-সুন্দরবন।

কলকাতা কেমন? এক কথায় অনন্য!

এই শহর হল 'সব পেয়েছির দেশ'। প্রাচীন সৌধ অথবা থিয়েটার ও শিল্প, সঙ্গীত, দারুণ-দারুণ রেস্টুরেণ্ট, আন্তর্জাতিক খেলাধুলো এবং কাছে-পিঠে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান—কি নেই এখানে? উপরন্তু আছে রকমারি লোভনীয় জিনিসে ঠাসা অসংখ্য দোকান। আর দুর্গাপূজা অন্যান্য উৎসব তো আছেই—তখন এই শহরের চেহারাই যায় পালটে, মেজাজও হয় আলাদা।

এবার বরং একটু পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে আসুন

অযোধ্যা পাহাড় এবং কাঁকরাঝোর অরণ্যে ঘেরা এইসব এলাকায় দু'চার দিন ঘোরার অভিজ্ঞতা সত্যিই রোমাঞ্চকর। তাছাড়া, কাছের ঝাড়গ্রামে এক প্রাসাদে বাস করার অভিজ্ঞতাও কি কম রোমাঞ্চকর! এছাড়াও আছে অপূর্ব নিসর্গ দৃশ্যে ভরা মুকুটমণিপুর।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আছে অসংখ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জায়গা, সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র

১৪ ও ১৫ শতাব্দীর বাংলা রাজাদের স্মৃতি-জড়িত গৌড় এবং পাণ্ডুয়া। নানান ঐতিহাসিক নিদর্শন, সিল্ক এবং হাতির দাঁতের জন্য সুপ্রসিদ্ধ মুর্শিদাবাদ। সংস্কৃতির পীঠস্থান, রবীন্দ্র-স্মৃতি ধন্য শান্তিনিকেতন। সঙ্গীত আর পোড়ামাটির অলংকরণের ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর। বাংলার ভ্রাম্যমাণ দার্শনিক বাউল জয়দেব লীলাক্ষেত্র এবং সুখ্যাত কবি জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলী। বক্রেশ্বরের স্বাস্থ্যদায়িনী উষ্ণ প্রস্রবণ এবং কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, তারাপীঠ ও গঙ্গাসাগরের মতো তীর্থক্ষেত্র।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট) কলি-৭০০০০১
ফোন: ২৮-৮২৭১, গ্রাম: TRAVELTIPS
১, নেহরু রোড দার্জিলিং,
ফোন: ২০৫০, গ্রাম: DARTOUR
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, ফোন: ২৪৬৫০
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমেশন ব্যুরো, এ/২ স্টেট এম্পোরিয়া,
বাবা খরগ সিং মার্গ, নিউ দিল্লী-১১১০০১
ফোন: ৩৫-৩৮৪০
করিম ম্যানসন, ৭৮৭, আন্না সালাই, মাদ্রাজ-৬০০০০২
ফোন: ৮৩-২৩৪৬
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৪২৮/৮৮

মার্ক টোয়েনের 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট' অবলম্বনে

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
ছবি - গৌতম কর্মকার

17

ওহ, এই ভাঁড়টার জ্বালায় গেলাম! স্যার দিনাদান দেখছি না ফাঁসিয়ে আমাকে ছাড়বে না।
চলে গেলেন দিনাদান। ঘোড়াটা সামনেই অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ---
গেল-- গেল-- সব গেল। ঘোড়া থেকে উল্টে পড়েছেন স্যার। আর উঠছেন না।
নিশ্চয়ই স্যার দিনাদান। খুশীতে অস্থির হয়ে পড়লাম আমি--
আপদ গেছে। মরে গেলেই মঙ্গল।
কে-- কে বললে এ কথা?
সর্বনাশ, এ যে স্যার স্যাগ্রামোর! বেশ নামকরা নাইট।
আমি এখন হোলি গ্রেইলের সন্ধানে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। আপনি তৈরী থাকবেন স্যার সর্বেসর্বা।
হোলি গ্রেইল? শেষ ভোজের সময় যে পাত্রে যীশু সুরা পরিবেশন করেছিলেন? দু-পাঁচ বছরের আগে তাহলে ফিরছেন না।
বেশ, তবে তাই হবে স্যার স্যাগ্রামোর। আমি রাজী।
এখন আমার প্রথম কাজ - ব্রিটেনবাসীর কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া। এরা দাঁত মাজে না, স্নান করে না। আমি ওই দাঁত মাজার বুরুশ, মাজন, সাবান- সব তৈরী করবার ব্যবস্থা করলাম। কারখানা করলাম বন্দুক পিস্তল তৈরী করবার। ষষ্ঠ শতাব্দীর ব্রিটেনে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকাকে দিনে দিনে এনে ফেললাম।
তবু রাজার মন ভরে না। এক দিন-
আর কেন, দু-চারটে ড্রাগন নাহয় দৈত্য-দানো মেরে এসো। আমি নিজে তোমাকে শ্রেষ্ঠ নাইটের মুকুট পরিয়ে দেবো সর্বেসর্বা।
বেশ, তবে তাই হোক মহারাজ।
18

বাহ, এইতো চাই। এই; কে রয়েছো, যাও – সেই মহিলাটিকে নিয়ে এসো এখানে।
মহিলা! সে আবার কে?
অ্যালিস্যান্ডি, তোমার খবরটা এঁকে দাও, ইনিই স্যার সর্বেসর্বা।
কী বলবো স্যার -- অনেক অনেক দূর-- একটা বিশাল উপত্যকা, তার মাঝখানে একটা দুর্গ-- সেখানে তিন তিনটে রাক্ষস--- সবাই একচক্ষু।
দয়া করুন স্যার সর্বেসর্বা।
কী করতে হবে আমাকে?
উদ্ধার করতে হবে। চল্লিশ জন রূপসী রাজকন্যা, ওদের হাতে বন্দী। রাক্ষস গুলোকে হত্যা করে ওদের মুক্তি দিন স্যার সর্বেসর্বা।
চলে যাও সর্বেসর্বা। এ তোমারই যোগ্য কাজ।
যথা আজ্ঞা মহারাজ।
যাত্রা শুরু হোল তখুনি।
আচ্ছা, কেল্লাটা এখান থেকে কতো দূর হবে?
আমি কি গুনতে জানি নাকি? অনেক দূর!
দিনের পর দিন চলেছি। বনের মাঝ দিয়ে, প্রান্তর টপকে, নদী পেরিয়ে। পথের যেন শেষ নেই।
আচ্ছা স্যান্ডি, তুমি যে সত্যি কথা বলছো, তার প্রমাণ দিতে পারো?
প্রমান! প্রমান আবার কী? আমি যা বলেছি তাই কি যথেষ্ট নয়?
এক দিন পথে পড়লো এক ডিউক আর তাঁর ছয় ছেলে।
আপনি কি এঁদের সাথে লড়বেন?
সর্বনাশ, সাত সাতজন যোদ্ধা! আমি একা!
19

যদি লড়তে না চান তাহলে বলুন, সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বেশ, তাই করো। এদের সঙ্গে লড়াই করে খামোকা সময় নষ্ট করি কেন?

স্যান্ডি এবার ঘোড়া থেকে নেমে ওদের ডেকে নিয়ে এলো।

আপনি-- স্যার সর্বেসর্বা! আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমরা ধন্য। আমরা এখন মহারাজের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলবো- প্রচন্ড যুদ্ধে আমাদের সাতজনকে আপনি পরাস্ত করেছেন। সারা জীবন আমরা আপনার বশীভূত হয়ে থাকবো স্যার।

বেশ, তাই করুন।

ক্যাম্পেলটের পথে যাত্রা করলো ওরা। আমরা চললাম স্যান্ডির সেই কেল্লার দিকে।

এমন অঘটন কী করে ঘটালে বলতো?

বাহ, সর্বেসর্বা মশায়ের মহিমা কি কম, যিনি দুপুরের সূর্যকে পর্যন্ত নিভিয়ে দিতে পারেন?

আরও অনেকগুলো দিন কেটে যাবার পর---

ঐ-ঐ দেখুন, তিনটে একচক্ষু রাক্ষস-- ঐ কেল্লা, আর দেখছেন তো, চল্লিশজনে রাজকন্যা। দাঁড়ান, গুণে দেখি।

মেয়েটা কি বদ্ধ উন্মাদ? বাঁশের খোঁয়াড়কে বলছে কেল্লা, রাখালদের বলছে রাক্ষস, আর ঐ শূকর গুলো কিনা রূপসী রাজকন্যা!

কী ভাবছেন স্যার? দয়া করে ওদের মুক্ত করে দিন। দোহাই আপনার!

যাক, বাঁচা গেল! এখন কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে।

শোন স্যান্ডি, আমি এবার যাদুঅস্ত্র প্রয়োগ করবো। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হবে। তুমি সরে যাও। খবর্দার, চোখ খুলবেনা, নইলে অন্ধ হয়ে যাবে। বুঝেছো?

বাঙালীর বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস

শংকর ঘোষ

[এক]

27শে অক্টোবর 1987তে প্রকাশিত "নিউইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল ঃ আইনস্টাইনকে অস্বীকার, পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন বার্তা আলোর চেয়ে দ্রুতগতি হতে পারে।" প্রতিবেদনটির শুরুতে বলা হয়েছে –"আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে কোনও কিছুই ভ্রমণ করতে পারে না—আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় নিশ্চিত সত্য এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে একদল ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানী আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে বার্তা পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন।" একদল ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানী বলতে পত্রিকাটি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা তিনজনই বাঙালী। এঁরা হলেন অমিতাভ দত্ত, অমিতাভ রায়চৌধুরী ও দীপঙ্কর হোম। এঁদের উদ্ভাবিত গাণিতিক সূত্র নাকি চ্যালেঞ্জও জানিয়েছে আইনস্টাইনের তত্ত্বকেই। এই উদ্ভাবন সত্য প্রমাণিত হলে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটবে বিজ্ঞান জগতে। বিশ্বব্যাপী বিতর্কের কেন্দ্রে যে এই তিন বাঙালী পদার্থ বিজ্ঞানী উঠে এসেছেন, তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ঘটনাটি প্রমাণ করে যে বাঙালীর বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস থেমে নেই।

জাতীয় ইতিহাসে বাঙালী প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশে বাঙালী মনীষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞানে বাঙালীর নবজনম সূচিত হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে। 1784 খ্রীস্টাব্দের 15ই জানুয়ারী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে 30 জন কলকাতাবাসী ইউরোপীয় ভদ্রলোক ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্য "এশিয়াটিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীরামপুর কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ দেওয়া হতে থাকে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার পরবর্তীকালে বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স।" এখানেই গবেষণা করে স্যার সি. ভি. রমন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চা নতুন করে শুরু হল "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" মাধ্যমে। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর "পদার্থবিদ্যা" গ্রন্থে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানকে সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে এদেশে বাঙালীর বিজ্ঞান সাধনাকে গতি দিয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" গ্রন্থের মাধ্যমে এদেশে বিজ্ঞান চর্চাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিজ্ঞান তপস্বী জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করে প্রমাণ করলেন যে, প্রাণীর মতো উদ্ভিদও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। লজ্জাবতী লতার সাহায্যে উদ্ভিদের প্রাণ স্পন্দনের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন তিনি। বর্তমানের রাডার, সাইবারনেটিক্স প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যার তিনিই পথিকৃৎ। 1917 সালে "বসু বিজ্ঞান মন্দির" প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাঙালীর বিজ্ঞান সাধনাকে এক স্থায়ী রূপ দান করেছেন। আচার্য বসুর শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্রের সমসাময়িক আর এক বাঙালী বিজ্ঞান প্রতিভা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর আবিষ্কৃত পারদ-জাত রাসায়নিক যৌগ "মারকিউরাস নাইট্রেট্", তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। আচার্য রায় বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়তা করেছেন। তারই ফলশ্রুতি 1901 খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত "দি বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।" বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি যে শিষ্যগোষ্ঠী তৈরি করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেযোগ্য হলেন—নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞান রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেশ গুহ, পুলিনবিহারী সরকার, হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন, রসিকলাল দত্ত প্রভৃতি।

গণিতের ক্ষেত্রে যে বিশ্ববন্দিত বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নাম করতে হয়, তিনি হলেন রাধানাথ শিকদার। তিনি শুধুমাত্র গাণিতিক সূত্র প্রয়োগে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপ করেছিলেন। একই ভাবে নাম করা যেতে পারে বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের। তিনি পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন "ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের।" এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে।

পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে বহুবার। দুই সতীর্থ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নাম যুক্ত হয়ে আছে তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আইনস্টাইনের "থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি" আবিষ্কৃত হলে বিশ্বে যে বিপুল সাড়া পড়ে যায় সত্যেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে আরো কয়েকটি নতুন সূত্র যোগ করে দিয়ে নিজেকেও স্মরণীয় করে নিলেন। ইলেকট্রনের গতির নিয়মের আবিষ্কর্তাও সত্যেন্দ্রনাথ। মেঘনাদ সাহার মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল আলোর ভর ও আপেক্ষিক তত্ত্ব। কলকাতায় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র "ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে সারা দেশে নিউক্লিয়র পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অধুনা বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নভোরশ্মি গবেষণায় শ্রীমতী বিভা চৌধুরীও সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছেন। প্রমথনাথ বসুর ইস্পাত শিল্পে অবদানের কথাও কখনো ভোলার নয়। নীলরতন ধর তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সম্বন্ধে গবেষণা করে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ডঃ ধর এলাহাবাদে গিয়ে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। খাদ্য বিষয়ে গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জন করায় বীরেশ গুহ ভারত সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা পদে বৃত হন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বাঙালীর কৃতিত্ব কম নয়। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন। স্যার নীলরতন সরকার কেবল খ্যাতিমান চিকিৎসকই ছিলেন না, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। "বেঙ্গল টেক্‌নিকাল স্কুল", "যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনলজির" প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্মরণীয় বাঙালীদের মধ্যে রয়েছেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ সুবোধ মিত্র প্রভৃতি। সহায়রাম বসুর পলিপরিণ আবিষ্কারক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিশ্বের সর্বাধুনিক আবিষ্কার নলজাত সন্তান গবেষণায় কৃতবিদ্য চিকিৎসক হলেন ডাঃ সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সমসাময়িক যুগে অন্যান্য বাঙালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন দেবেন্দ্র মোহন বসু, শিশির কুমার মিত্র, পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। জেনেটিক্স এর ক্ষেত্রে ডঃ জগজ্জিৎ ঘোষ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। বটানীতে ডঃ অরুণ শর্মা ভাটনগর পুরস্কার লাভ করেছেন। গাছ গাছড়া নিয়ে ভেষজ গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তেল নিয়ে গবেষণায় মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর নাম বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণযোগ্য। আধুনিক যুগে বাঙালীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আরো কয়েকজন স্মরণীয় ব্যক্তি হলেন—অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অর্চনা শর্মা প্রমুখ। আমেরিকায় কুমেরু অভিযানের ভৌগোলিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রধান ছিলেন শংকর চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় প্রতিটি কুমেরু অভিযানেরই সঙ্গী ছিলেন কোন না কোন বাঙালী বিজ্ঞানী। আনন্দ চক্রবর্তী দূষিত তেলের জীবাণুধ্বংসী ব্যাকট্রিরিয়া সৃষ্টি করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। "ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউসনে"র প্রাক্তন প্রধান পদার্থ বিজ্ঞানী সন্তোষকুমার সেনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নানা দেশে কাজে লাগিয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা হলেন ডঃ সুখময় লাহিড়ী, ডঃ নরেন্দ্র কর্মকার, পশুবিজ্ঞানী ভৈরব ভট্টাচার্য, শল্য চিকিৎসাবিদ্ ডঃ বিমল ঘোষ প্রমুখ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ও পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে বহু বাঙালী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

বাঙালীর এই বিজ্ঞান সাধনা বঙ্গভূমিকে এক গৌরবের আসনে বসিয়েছে তবু কিছু সংশয়, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। কেন আজ নবীন বাঙালী গবেষকেরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন? কেন তাঁরা কৃতবিদ্য হয়ে স্বদেশে ফিরছেন না? তার উত্তর খুঁজলে দেখতে পাই বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক চাপ বেড়েই চলেছে, পাশাপাশি কমছে পশ্চিমবঙ্গে গবেষণার আধুনিক সুযোগ সুবিধা। সক্রিয় সরকারী প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারত, কিন্তু সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন। এমন বহু নবীন গবেষক অর্থ ও যশের প্রত্যাশায় দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বিদেশে। "ব্রেনড্রেনের" জোয়ার দেখা দিয়েছে। বর্তমান কালে নবীন বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা যদি সামান্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, তবে বঙ্গজননী ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠবেনই। বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কারের ফলে বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা তখন জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

জয়ন্ত মণ্ডল

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে (1895-99) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গবেষণা। ক্ষুদ্র মৌলিক যন্ত্র তৈরি করে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেন যে তৎসৃষ্ট সম্বন্ধে 2·5 থেকে 0·5 সেমি দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের দৃশ্য আলোকের সব ধর্মই সমান। এই যন্ত্রটি জে. জে. টমাস কর্তৃক 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' গ্রন্থে (নবম সংস্করণ) বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জগদীশ চন্দ্র বসু জৈব ও অজৈব পদার্থে উত্তেজনার ফলে সাড়ার সমতার বিষয়ে গবেষণা করেন। (1900) প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিদ্যা কংগ্রেসে তিনি একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনাপ্রসূত 'বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা'। এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থায় বক্তৃতা চলে। এই সমস্ত গবেষণার বিষয়ে তাঁর 'রেসপনসেস ইন দি লিভিং অ্যাণ্ড নন লিভিং (1902) বর্ণিত হয়েছে। 'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রোফিজিওলজি' নামক গ্রন্থে (1907) ধাতু এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশী নিয়ে সমশ্রেণীর বহু বর্ণনা দিয়েছেন। জনসাধারণকে দেখান যে বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক দ্রব্য সকল বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় ঐ তিন জাতীয় পদার্থ একই রকম সাড়া দেয়। আচার্য্য বসুই প্রথম মানুষের স্মৃতিশক্তির অজৈব মডেল বা যান্ত্রিক নমুনা তৈরি করেন। রেডার যন্ত্র, ইলেকট্রনিক হিসাব যন্ত্র বা কম্পিউটার-এর সাহায্যে মানুষের ঐচ্ছিক কার্য্যাবলীর অনুকরণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে (1930-32) জগদীশ চন্দ্র উদ্ভিদ প্রাণীর পেশীর মধ্যে তুলনা-মূলক শারীর-বিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসাবে উদ্ভিদের উপর প্রাকৃতিক ও কৃত্তিম উত্তেজনায় ফলাফল সম্পর্কে তিনি বিশদ গবেষণা করেন। প্রাকৃতিক উত্তেজনার মধ্যে তাপ, আলো, ও মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল এবং কৃত্তিম উত্তেজনার মধ্যে বৈদ্যুতিক ও তাপীয় আঘাত তাঁর পর্যালোচনার বিষয় ছিল। সূক্ষ্মতম সঞ্চালনকে বহুদূর বর্ধিত করে দেখার যন্ত্র। ক্রেস্কোগ্রাফ তর দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদ ও বৈদ্যুতিক আঘাতে কুঞ্চিত হয়ে সাড়া দেয়।

আচার্য্য বসু Automatic recorder for photosynthesis নামক যন্ত্রটি নিয়ে গবেষণা করার সময় দেখেছেন যে হজমের সময়ে কতকগুলি বস্তু অতি সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদের দেহে প্রয়োগ করলে তাদের হজমের কাজ হঠাৎ অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তিনি একশো কোটি ভাগ জলে কোন দ্রব্যের কেবল একভাগ মাত্র মিশিয়ে সেই জল উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিয়ে ছিলেন। এই অতি সূক্ষ্ম কণিকার উদ্ভিদের হজম শক্তি বেড়ে গেছিল। শুধু তাই নয়। একশো কোটি ভাগ জলে একভাগ মিশিয়ে তিনি যে ফল পেয়েছিলেন, দুশো কোটি ভাগ জলে এক ভাগ মিশিয়ে তার দ্বিগুণ ফল পেয়েছিলেন। অর্থাৎ দ্রব্যটি যত অল্প পরিমাণে দেহে প্রয়োগ করা যায়, পরিপাক শক্তির উপর তার কাজ তত বৃদ্ধি হয়। এতে করে ভেষজ তত্ত্বের কোন এক বড় আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নয়। আচার্য্য বসু আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে একটা মিল ধরা পড়েছে। এক ভাগ থাইরয়েড গ্রন্থির রসের সাথে (Extract of thyroid Gland) একশো কোটি ভাগ জল মিশিয়ে একটা বস্তু তাঁরি একটা উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করান। এতে হজমের মাত্রা 70% বেশি হয়। এই প্রকারে আয়োডিন প্রয়োগ করেও একই ফল হয়েছিল। জীবন ক্রিয়ার রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্মতম কণিকায় এই

প্রকার কার্য্য হঠাৎ অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু এটা সত্য। উদ্ভিদ-দেহের এক সত্য উৎঘাটনের সন্ধান মিললো। প্রাণীর জীবন-ক্রিয়া যে সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, একথা কেউ বলতে পারে না। ভিটামিন ও হরমোনস্ প্রাণীর শরীরে অতি অল্প পরিমাণে প্রবিষ্ট হয়ে বড় কাজ হতে দেখা গেল। এটা শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে এখনও অস্পষ্ট।

উত্তেজনায় সক্ষম উদ্ভিদ লজ্জাবতীর ব্যবহারের দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার সমতা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করা যায়। লজ্জাবতীর পাতা অথবা শাখার যে কোনও স্থলে বৈদ্যুতিক আঘাত করলে দূরবর্তী বৃন্তগ্রন্থি সমূহে কুঞ্চন ঘটে পত্রযুক্ত বৃন্তগুলি নুয়ে পড়ে। প্রাণীদেহের পেশী সংযুক্ত তন্তু বিদ্যুৎশক্তি, উত্তাপ অথবা রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে উত্তেজিত করা হলে পেশীর যে সংকোচন ঘটে সেই বস্তুটা দেখিয়েছিলেন, এবং লজ্জাবতীর দেহের সঙ্গে তুলনা করে প্রমাণও দিয়েছেন। বন চাঁড়াল দেশমোদিয়াম গীরানস্ (Desmodium gyrans) নামক উদ্ভিদের পার্শ্ববর্তী সূক্ষ্ম পত্রগুলোর ছন্দোবদ্ধ ওঠানামা সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই ধরনের সঞ্চালন প্রাণীর দেহের হৃদযন্ত্রের গতির সঙ্গে তুলনীয়। ক্ষীণ গতিকে বহুগুণ বর্ধিত করে লিপিবদ্ধ করার নানা রকম স্বয়ং লেখ যন্ত্র আচার্য্য বসু আবিষ্কার করেছেন। তাদের মধ্যে পূর্বোক্ত 'ক্রেস্কোগ্রাফ' ব্যতীত স্কিগমোগ্রাফ, পেটোমিটার, ও ফোটোসিন্থেটিক বাবলার প্রভৃতি যন্ত্র উল্লেখ-যোগ্য। তিনি উদ্ভিদের জল শোষণ ও সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ ও জীবনবিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু 30 নভেম্বর 1859 খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের মৈমন সিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তিনি প্রথমে ফরিদপুরের গ্রাম্যবিদ্যালয়ে পরে কলিকাতায় (1870-80) সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। 1889তে বি, এ, পাশ করে ইংল্যাণ্ড যাত্রা, তারপর বিলাতে শিক্ষাকাল (1890-94)। আচার্য্য বসু কেমব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি, এ, ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস, সি পাশ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এবং (1915) "এমেরিটাস" অধ্যাপক হিসাবে অবসর নেন।

জগদীশচন্দ্রের বাংলা লেখায় শিল্পী জনোচিত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বাংলা রচনাবলী 'অব্যক্ত নামক পুস্তকে (1328 বঙ্গাব্দ) সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ চন্দ্র পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসঙ্গ জগদীশচন্দ্র যখন এদেশে তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন, সেই কালের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় তাদের পত্রাবলীর মধ্যে। তিনি ভারতীয় প্রাচীন পুরানাদির বিশেষ অনুরাগী পাঠক ছিলেন। যৌবনকালে তদানিন্তন বৃহৎ আকারের ক্যামেরা বহন করে ভারতের প্রাচীন বিভিন্ন তীর্থে প্রাচীন গুহা মন্দিরগুলোতে ও প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয় সমূহের ধ্বংসাবশেষে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার ভূমিতে তিনি ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করার সময় সেই গৃহের নানা স্থানে ঐ সকল প্রাচীন গুহামন্দিরের দেওয়াল চিত্রের অনুকরণে চিত্রাঙ্কিত করেছিলেন।

তিনি (1920 রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন। (1926-30) পর্যন্ত লীগ অফ লেসনস এর ইণ্টেলকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য। (1927) ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ও (1928) ভিয়েনার অকাদেমি অফ সায়েন্স-এর বৈদেশিক সভ্য নির্বাচিত হন। (1915) অধ্যাপনার কাজে অবসর গ্রহণ করার পর দু-বছরের মধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিরোধান দিন পর্যন্ত তিনি এই মন্দিরের দায়িত্ব পরিচালনা করেছিলেন।

তারপর 1937 সালের 23 নভেম্বর তিনি ধরিত্রী থেকে চিরবিদায় নেন। তাঁর এই একশো আঠাশতম জন্ম বার্ষিকীতে আমরা জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারত কোষ 3য় খণ্ড,

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর

কিশোর রচনা সমগ্র

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। দাম ৩০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

বিজ্ঞানীর টুকিটাকি

নরবার্ট ওয়াইনার

1920 সালের গোড়ার দিকে বোস্টন শহরের পুলিশেরা ধর্মঘট করে। তখন যে সব লোক পুলিশের কাজ স্বেচ্ছায় করার জন্যে এগিয়ে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। নাম তাঁর NORBERT WIENER, নিয়মানুগভাবে ওয়াইনারকে পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়। তাঁকে সদলবলে রাস্তায় রাস্তায় পাহারাদারীর কাজে পাঠানো হয়।

প্রথম কয়েকদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নি।

তারপর একদিন তিনি যখন দলের অন্যান্যদের সঙ্গে বস্তির একটি রাস্তায় পাহারা দেবার জন্যে বেরুলেন, তখন দেখলেন যে রাস্তার এক কোণে ল্যাম্প পোস্টের নীচে একদল যুবক বেশ জোরে তর্কাতর্কি শুরু করে দিয়েছে। যুবক দলের সবাই পড়ুয়া। একজন তার অ্যালজেব্রার একটা অঙ্ক নিয়ে সমস্যায় পড়েছে এবং তারই সমাধান নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তার জোর তর্কাতর্কি চলছে।

পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন গণিতজ্ঞ পুলিশ নরবার্ট ওয়াইনার তর্করত যুবকদের কাছে গেলেন। অ্যালজেব্রার সমস্যাটি শুনে তখনই তার সঠিক সমাধান করে দিলেন। সেই সঙ্গে বাগবিতণ্ডার অবসান ঘটিয়েও দিলেন।

কয়েক বছর পরে গণিতজ্ঞ ওয়াইনার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন যে সেদিনের তর্কাতর্কিতে অংশগ্রহণকারী যুবকদের একজন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজিতে উচ্চতর গণিত শিক্ষালাভের জন্যে ভর্তি হয়েছিল এবং সে ছিল ওয়াইনারের প্রথম দলের ছাত্রদের অন্যতম।

স্যার আইজ্যাক নিউটন

কথিত আছে যে, স্যার আইজ্যাক নিউটনের অন্তরঙ্গজন ছিল কম। সেই জন্যে তিনি সঙ্গী হিসাবে পুষে রেখেছিলেন একটি বিড়ালকে। কিন্তু তাঁর লেখাপড়ার ঘরে বিড়ালটির ঘন ঘন আসা যাওয়া তাঁর বিরক্তির উদ্রেক করে। তখন তিনি তাঁর পড়ার ঘরের দেওয়ালে একটি গর্ত করে দেন, যাতে ক'রে বিড়ালটি সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

এরপর একদিন নিউটন দেখলেন বিড়ালটি তার বাচ্চা-কাচ্চা সহ ঘরে আসছে। বিজ্ঞানী পরিস্থিতিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন এবং বিড়াল ছানাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে দেওয়ালে আগেকার গর্তের বেশ কিছুটা নীচে আরেকটি গর্ত ক'রে দিলেন। ছোট ও নীচু গর্তের মধ্যে দিয়ে বিড়ালছানাদের যাতায়াত করা সহজতর হলো।

থেলস

মিলেটাস এর 'থেলস' একজন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারূপে তাঁকে অভিহিত করা হতো।

প্রতি রাতের মতো সে রাতেও তিনি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আকাশ পর্যবেক্ষণে তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে সে রাতে রাস্তার একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে হাঁটুতে তাঁর জোর আঘাত লেগেছিল। এক বৃদ্ধা মহিলা দেখতে পেয়ে তাঁকে গর্তের মধ্যে থেকে টেনে তুলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কে হে'?

উত্তরে থেলস বলেছিলেন, 'আমি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলাম।' বৃদ্ধা তখন মন্তব্য করেছিলেন, 'মিথ্যুক কোথাকার। পায়ের তলার মাটি যে দেখতে পায় না, সে কিনা আবার আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করে।'

আইনস্টাইন

1933 খ্রীস্টাব্দের কথা।

হিটলার তখন জার্মানীর সর্বময় কর্তা। আইনস্টাইন তখন ইউনাইটেড স্টেটস পরিদর্শনে গেছেন সেখান থেকে সবাইকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে স্বদেশে আর তিনি কোনও দিন ফিরে যাবেন না।

এক জার্মান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইনে পরদিন বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো 'আইনস্টাইনের কাছ থেকে শুভ সংবাদ এসেছে। তিনি আর দেশে ফিরে আসবেন না।

নাজি সেনারা আইনস্টাইনের ভিটে তছনছ ক'রে ফেললো। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যে টাকা ছিল, জার্মান সরকার সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করলো। উপরন্তু আইনস্টাইনের মাথার দাম ঘোষণা করা হলো এক হাজার পাউণ্ড।

আইনস্টাইন যখন এ সব কথা শুনলেন তখন তিনি বললেন, 'আমার মাথার দাম যে এতো তা কখনও ভাবতে পারি নি।'

হাইম্যান লেভি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন সবে শুরু হয়েছে তখন ইংরেজ বিজ্ঞানী HYMAN LEVY আশা করেছিলেন যে Royal flying Corps এ তিনি একটি চাকরি পাবেন।

তাঁর এই আশার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ তিনি ইহুদী ছিলেন দ্বিতীয়তঃ ছিলেন জার্মান বিদ্বেষী এবং তৃতীয়তঃ বায়ুগতিবিদ্যায় তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

তাঁর চাকরির ইণ্টারভিউ খুবই মজাদার হয়েছিল। ইণ্টারভিউ বোর্ডের এক সদস্যের বায়ুগতিবিদ্যা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। তিনি চাকরিপ্রার্থী LEVY কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন কি ?

বিস্মিত হয়ে LEVY জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে না। কখনও চেষ্টাও করিনি।'

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতার পর ইণ্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী LEVY কে শুধালেন, 'আমাদের আপনি কিছু প্রশ্ন করতে চান কি ?'

LEVY শুধালেন এ চাকরির জন্য আমাকে ঘোড়ায় চড়া জানতে হবে কেন ?'

উত্তর এলো, 'যে লোক ঘোড়ায় চড়তে জানে সে নিশ্চয়ই উড়োজাহাজও চালাতে জানে।'

—ইণ্টারভিউ শেষ হলো।

বিজ্ঞানী HYMAN LEVY ঐ চাকরির জন্যে মনোনীত হলেন এবং কমিশনড অফিসাররূপে কাজে যোগ দিলেন।

অ্যানড্রুজ মিলিকান

রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিকান নামে এক আমেরিকান যুবক যখন কলেজে পড়াশুনা করতেন। তখন তাঁর সতীর্থ অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই যুবক ভবিষ্যতে বড় বিজ্ঞানী হবে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মিলিকান তখন ডিগ্রী পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ গ্রীক সাহিত্য নিয়ে গবেষণার জন্যে তিনি একটি বৃত্তিও পেয়েছিলেন।

মিলিকান একদিন ডিগ্রী পরীক্ষার পড়াশুনা নিয়ে যখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর গ্রীক অধ্যাপক তাঁকে বললেন 'রবার্ট' প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু ক্লাশ নাও।'

—অধ্যাপকের কথা শুনে মিলিকান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, কারণ পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর তেমন জ্ঞান ছিল না। ছাত্রকে ইতস্ততঃ করতে দেখে অধ্যাপক মশাই বললেন, 'রবার্ট', আমার গ্রীক সাহিত্যের ক্লাশে তুমি চমৎকার পড়াশুনা করেছ ও বরাবরই ভাল ফল দেখিয়েছ। কাজেই তোমার উপর আমার পুরো আস্থা আছে। পদার্থ বিজ্ঞানও তুমি বেশ ভালভাবেই পড়াতে পারবে।'

গুরু আজ্ঞা অমান্য করা যায় না। রবার্ট মিলিকান পদার্থ বিজ্ঞান পড়তে ও পড়াতে শুরু করলেন। অবশেষে সতীর্থদের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিকান ভাল অধ্যাপকই হলেন না, হলেন মস্ত বড় পদার্থবিজ্ঞানী। এই আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী একটি ইলেকট্রানের আধান নির্ণয় করে এবং ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টের উপর গবেষণা করে 1923 খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেণ্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা 50·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।
- M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।
- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞান রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।
- পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত রচনা এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

ইলেকট্রনিক্স উপকরণ প্রসঙ্গে দু-চার কথা

সৌমেন মজুমদার

ইলেকট্রনিক্স-এর যে কোন কাজ করতে গেলে আমাদের কিছু কথা অবশ্যই জানতে হবে। যে কোন একটি সার্কিটের ছবি দেখে তা তৈরি করার সময়, বিভিন্ন উপকরণকে পরস্পরের সঙ্গে ঝাল [Iron,] দিয়ে জুড়তে হবে। 'ঝাল' এর ইংরেজী কথা Soldering, অনেকে এটাকে 'তাতাল' বলে থাকে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'ক্ষমতা' সম্পন্ন 'Iron' ব্যবহার করা হয়। যেমন ট্রানজিস্টার দিয়ে সার্কিট তৈরির জন্য সাধারণতঃ কম ক্ষমতাবিশিষ্ট (Iron] ব্যবহার করাই ভাল। এর ক্ষমতা আনুমানিক (20) ওয়াট, যার সাহায্যে অর্থাৎ যে বস্তুর সাহায্যে একটি উপকরণের কোন প্রান্তকে অন্য কোন একটি উপকরণের প্রান্তে বা দুটি তারের মধ্যে জোড়া হয়, তা সীসা ও দস্তার সংমিশ্রণে তৈরি। যে বস্তুর সাহায্যে উপকরণগুলির সংযোগ করা হয় সেটাকে 'রাং' বলে। এই 'রাং' সরু লম্বা তারের মত আবার 'পিণ্ড' আকারেও পাওয়া যায়। সরু তার 'রাং' তৈরি করার সময়, ফ্লাক্স (flax) বা রেজিন্ (rosin) এর সংমিশ্রণও নেওয়া হয়, তার জন্য কোন জায়গায় Soldering করার সময় সরু রাং ব্যবহার করলে কিছু ধুঁয়ো নির্গত হয়, পিণ্ডল 'রাং' এর ক্ষেত্রে এই রেজিন্ (rosin) আলাদা ভাবে ব্যবহার করতে হয়। চিত্রে Iron বা [তাতাল], এবং সরু তার রাং-এর গঠন দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে।

এবার দেখা যাক (Solder) করতে গেলে পরপর কেমন করে এগোন যাবে। প্রথমে Solder করার সময়, উপকরণগুলির যে প্রান্তে সোল্ডার (Solder) করতে হবে সেই প্রান্তকে 'ব্লেড বা চাকুর সাহায্যে চেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাতালটিকে (Iron) বিদ্যুৎ সংযোগ করলে তা গরম হতে শুরু করবে। তাতাল গরম হয়েছে কিনা বোঝার জন্য 'রাং' এর একটি তাতালের মুখে ঠেকিয়ে দেখতে হবে রাং গলছে কিনা। গললে বুঝতে হবে তাপ (heat) ঠিক আছে, ভাল ভাবে কাজের জন্য 'রাং' গলে যাওয়া দরকার, অন্যথায় শুকনো ঝাল (dry solder) হয়ে সার্কিটের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বহুদিন ধরে ঝালাই (Soldering) করতে করতে এই বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা জন্মায়। ঝালাই (Soldering) প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে, যে জায়গায় ঝাল দিতে হবে সেই জায়গাটি যথেষ্ট গরম না হলে 'রাং' যে জায়গায় ঝাল দিতে হবে সেই জায়গাটি যথেষ্ট গরম না হলে 'রাং' তার গলবে না, বরং শুকনো ঝাল হতে পারে। আবার কোন জায়গাকে

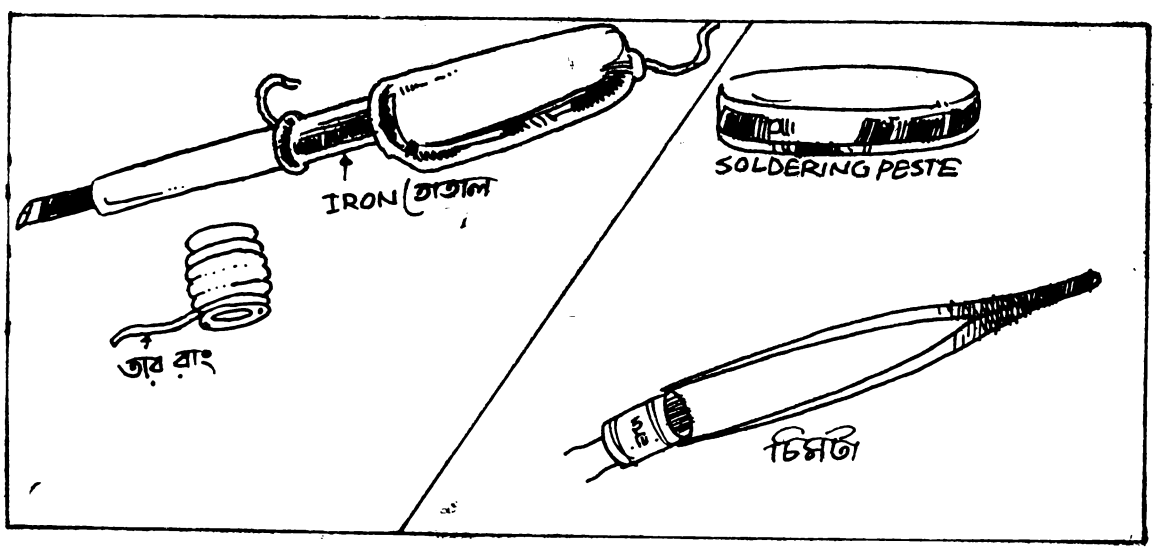

অনেকক্ষণ ধরে গরম করলে অন্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন কোন তারের অন্তরক পদার্থ (প্লাস্টিক) গলে যেতে পারে। সুতরাং ঝামেলার ব্যাপার থেকে যতটা এড়ানো যায় তত ভাল।

ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত যে কোন কাজ করতে গেলে অর্থাৎ কোন জিনিস তৈরি করতে গেলে ধৈর্য্য ধরতে হবে। ইলেকট্রনিক্স উপকরণগুলি যে বোর্ডের উপর বসাতে হবে সেই বোর্ডটি (PCB বা Vero board) ধারাল কোন পদার্থ (ব্লেড) দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সার্কিটে যে রকম থাকবে সেই রকম ভাবে বোর্ডে উপকরণগুলি লাগিয়ে তারপর Solder করতে হবে। এমন ভাবে Solder এবং উপকরণগুলি করতে হবে যাতে প্রোজেক্টটি সুন্দর দেখতে হয়। এর পর বোর্ডের তলাকার বেরোনো অংশগুলো কেটে ফেলে দিলে প্রজেক্ট ভাল হবে।

Solder প্রসঙ্গে কতকগুলো কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যেমন –(1) ডায়োড, ট্রানজিস্টার, IC প্রভৃতি উপকরণগুলি বেশি গরমে নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য ট্রানজিস্টার, ডায়োড প্রভৃতি ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে, তারা বেশি গরম না হয়। IC প্রসঙ্গে কিছু কথা

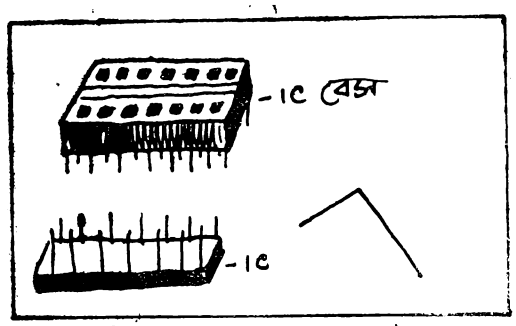

বলি। IC লাগানোর সময় IC 'বেস' (Bace) ব্যবহার করতে পার এর ফলে IC নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না, আর না ব্যবহার করলে, মেইন অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুইচ বন্ধ করে ঝালাই করতে হবে। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে 10 সেকেণ্ডের বেশি যেন IC-এ পা গরম না হয়। এক্ষেত্রে 10 watt-এর Iron ব্যবহার করলে ভাল হয়। আজ এখানেই শেষ করলাম। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স উপকরণ সম্বন্ধে কিছু কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

95, রেল পার্ক, রিষড়া, হুগলী।

নিজে নিজে কর

আশ্চর্য ইণ্টারকম

বাণীপ্রসাদ দাস, সুমন মুখার্জী

ইণ্টারকমতো আমরা অনেকেই দেখেছি। কিন্তু আজকে যে রকম ইণ্টারকম তৈরি করা শেখাবো তা যেমন সোজা তেমনি আশ্চর্যজনক। এতে দুটি স্পিকারের দুটি পয়েণ্ট তার দিয়ে যোগ করে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকি ব্যাটারি পর্যন্ত নেই! সার্কিটটি নিম্নরূপ।

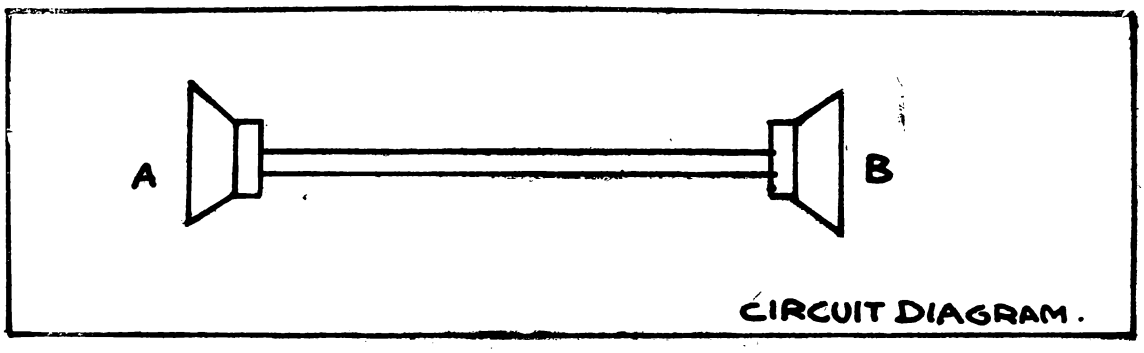

উপরে দেখ। চিত্র অনুযায়ী স্পিকার Aতে কথা বললে Bতে শোনা যাবে এবং Bতে কথা বললে Aতে শোনা যাবে।

সত্যি খুবই আশ্চর্যজনক না? এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের আবিষ্কার। হঠাৎ হয়ে যাওয়া এক অপূর্ব বিস্ময়কর যন্ত্র। তাই না?

গোয়াবাগান, চন্দননগর, হুগলী। (দশম শ্রেণী)
হাটখোলা, বেনেপাড়া লেন, চন্দননগর, হুগলী।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

ক্যুইজ কনটেস্ট

অক্টোঃ+নভেঃ '88 VII-VIII

গ্রেড -I

1. **এই প্রাণীটির নাম কি ?**

2. ভারতের বৃহত্তম মোটর গাড়ি তৈরির কারখানাটি কোথায় ?

3. ভারতের কোন্ রাজ্যের জনসংখ্যা সর্বাধিক ?

4. [illegible] অঙ্গার, হীরা এবং [illegible] মধ্যে কোনগুলি অধাতু ?

5. মার্কারির চিহ্ন কি ?

6. বিশুদ্ধ জলের মধ্যে জলের উপাদান মৌলগুলির [illegible] কি ?

7. **কোনও বস্তুর ভার মাপা হয় কোন্ যন্ত্র দ্বারা ?**

8. **নিম্নলিখিতগুলির** মধ্যে কোন্‌টি যৌগ ?

CO ; Co স্টীম।

তাপ বিয়োজন এর একটি [illegible]।

[illegible] পশ্চিমবাংলার কোথায় [illegible] **কারখানা আছে ?**

গ্রেড II

ক্যুইজ কনটেস্ট

অক্টোঃ+নভেঃ '88 IX—X

গ্রেড—II

1. ইউক্রেনের রাজধানীর নাম কি ?

2. ভারতের প্রথম **শুল্ক মুক্ত** বন্দর কোন্‌টি ?

3. সেণ্ট লরেন্স নদীর একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। ঐ জল-প্রপাতের নাম কি ?

4. রাসায়নিক সমীকরণে ↓ চিহ্ন এবং ↑ চিহ্ন কি বোঝায় ?

5. এই প্রাণীটির নাম কি ?

6. নিচের কোনটি বেনজিন-এর সংকেত ?

(a CH_4 (b) C_6H_6

(c) C_2H_2

7. সমমেল (Harmonis) বলতে কি বোঝ ?

8. স্থির চাপে কোন গ্যাসের উষ্ণতা বাড়ালে গ্যাসের আয়তন কমবে না বাড়বে ?

9 একটি ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ কতো ?

10. এক গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম (Mg = 24) এ যদি x সংখ্যক পরমাণু থাকে তবে এক গ্রাম কার্বন (C = 12) এ কতো সংখ্যক পরমাণু থাকবে ?

গ্রেড III

ক্যুইজ কনটেস্ট

অক্টোঃ+নভেঃ '৪৪ XI—XII

গ্রেড—III

1. মারুতি মোটর গাড়ি নির্মাণের কারখানাটি কোথায় ?

2. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কি ?

3 ভারতের কোন্ রাজ্যে সর্বাধিক আকরিক লোহ সঞ্চিত আছে ?

4. চার গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম (Mg = 24) এবং চারগ্রাম লোহার (Fe = 56) মধ্যস্থিত পরমাণু সংখ্যার অনুপাত কতো ?

5. 'জোঁক' কোন্ পর্বের একটি সাধারণ প্রাণী ?

6. মানুষের মেরুদণ্ডে কতগুলি অস্থিখণ্ড আছে ?

7. গ্রীনউইচে যখন 9-30 A M. তখন ভারতেয় Standard time কতো ?

8. বয়োবৃদ্ধি সংক্রান্ত পঠন-পাঠনের বৈজ্ঞানিক নাম কি ?

9. AIDS রোগের পুরো নামটি কি ?

10. **এই প্রাণীটির নাম কি ?**

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

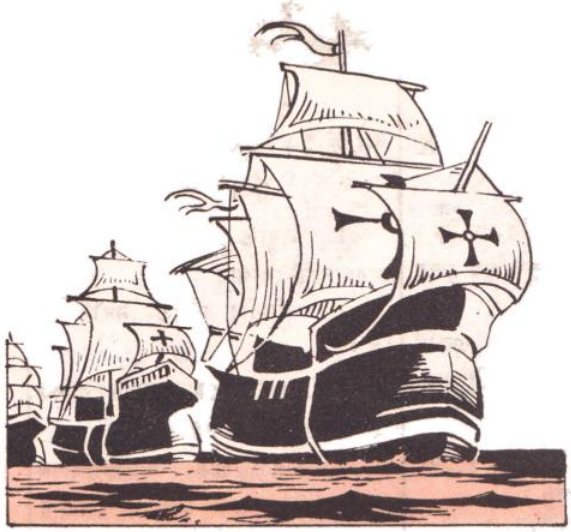

মানব সভ্যতার ইতিহাসে 1492 খ্রীস্টাব্দের 3 আগস্ট একটি অবিস্মরণীয় দিন। সভ্য পৃথিবীর মানচিত্রে এ দিনই শুরু হোল এক নতুন দিগন্তের অনুপ্রবেশ। আটলান্টিকের জলপথ বেয়ে অসীম সম্ভাবনার রাজপথ কলম্বাস উন্মুক্ত করে দিলেন মানুষের সামনে।

যাত্রা শুরু হয়েছিল সূর্যোদয়ের আধঘণ্টা আগে। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ যখন নীলসাগরে আছড়ে পড়লো তখন চক্রবালে প্যালোসের তটরেখা রাত্রির ঘুম ভেঙে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। উদ্বেলিত কলম্বাস চেয়ে চেয়ে দেখলেন—তাঁর জীবন-স্বপ্ন তিনটি মাত্র জাহাজের উপর ভর করে ভেসে ভেসে চলেছে।

একদিন দু'দিন চমৎকারভাবে কেটে গেল। কিন্তু তৃতীয় দিনেই শুরু হোল অঘটন। মার্টিন পিনজন তাঁর পিনটা থেকে একটা ছোট নৌকা নিয়ে শান্তামারিয়ায় উঠে এলেন : মিস্টার ক্রিস্টোফার, পিনটার মালিক আমাদের ঠকিয়েছে।

কেন ? কী দেখলেন ?

প্রবঞ্চক লোকটা তার পুরাতন জাহাজখানা আপনার নির্দেশ মতো মেরামত করেনি। অজস্র ত্রুটি। ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের অনেক অংশই এখন আলগা হয়ে পড়েছে। জানি না, আর কতো দিন এগিয়ে যেতে পারবো।

যেতেই হবে মিস্টার মার্টিন। এখন ক্যানারী পর্যন্ত তো চলুন। তারপর ...

অভিজ্ঞ মার্টিন একজন খ্যাতিমান সুদক্ষ নাবিক। তাই সহজভাবেই হাসলেন : আমিও তাই ভেবেছি। ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ আর সপ্তাহখানেকের পথ। এর মধ্যে আমি ভাসতে ভাসতেই দরকারী মেরামত কিছু কিছু করে নেবো ক্রিস্টোফার। তারপর ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছলেই ...

আরও কয়েক দিন নষ্ট হবে আমাদের। কিন্তু উপায় কী? কলম্বাসের বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে নেমে গেল।

12 আগস্ট ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের তটভূমিতে কলম্বাস পৌঁছলেন। কী করবেন তিনি এখন? জাহাজখানা সারাবেন, নাকি কিনে নেবেন একটা নতুন জাহাজ?

দ্বীপ থেকে দ্বীপে কলম্বাস ঘুরলেন কিন্তু মনের মতো কোনও জাহাজ কোথাও পেলেন না। অগত্যা মার্টিন তাঁর সাধ্যমত পিনটার মেরামতির কাজে লেগে পড়লেন। এখনো অনেক ঢেউ, অনেক তাণ্ডব পিনটা পার হলে তবেই ভারতের মাটি সে স্পর্শ করতে একদিন পারবে। নচেৎ টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে।

দিনের পর দিন চলে গেল দুরূহ মেরামতির কাজে। দেখতে দেখতে আগস্ট শেষ হয়ে এসে পড়লো সেপ্টেম্বর। নাবিকদের দিনগুলো এখন মনের আনন্দে কেটে যায় ক্যানারীর দ্বীপগুলিতে। ভয়ঙ্কর আটলান্টিকের চেয়ে দ্বীপের সমাজ-জীবন অনেক লোভনীয়, অনেক নিরাপদ। আর সূর্যাস্তের এক একটি বিকেল কলম্বাস উন্মুখ হয়ে চেয়ে চেয়ে পশ্চিমে দেখেন—ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটে আসছে চক্র-দিগন্তের আড়াল থেকে। কলম্বাস অটল—ঐ আড়াল তিনি আর থাকতে দেবেন না। পিনটার নবরূপায়ণ যেদিন শেষ হবে, তিনি সেদিনই আবার ভেসে পড়বেন নির্দিষ্ট অভিযাত্রায়।

খবর ছুটে এলো হঠাৎ। পোর্তুগাল থেকে একটা জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়েছিল। তারই নাবিকের মুখে কলম্বাস শুনলেন—রাজা জন একদল সৈন্য পাঠিয়েছেন তাঁকে ধরতে। পোর্তুগালের প্রস্তাব উপেক্ষা করে কলম্বাস স্পেনের হয়ে অভিযানে চললেন, এ তিনি সহ্য করবেন না। মাঝ পথেই তিনি ডুবিয়ে দেবেন কলম্বাসের নৌবহর। বন্দী করবেন দুর্বিনীত নাবিককে।

লিসবনের বন্দর থেকে জাহাজ ছুটে আসছে ক্যানারীর লক্ষ্যে। এখন উপায়? লড়াই করতে কলম্বাস জানেন। এ তো সহজে তাঁকে কাবু করা কখনো যাবে না। কিন্তু সময় নষ্ট হবে অনেক। নাবিকদের সংখ্যাও বেশ কিছু কমে যাবে। অতএব না, ভগ্নদেহ পিনটাকে নিয়েই যাত্রা শুরু করবার নির্দেশ দিলেন কলম্বাস। 17 সেপ্টেম্বর শুরু হোল পশ্চিমমুখী অভিযান।

সুবিবেচক কলম্বাস কিন্তু সরাসরি পশ্চিমে গেলেন না। ক্যানারীর তটভূমি সামনে রেখেই তিনি চালিত করে চললেন তাঁর বহর। শান্ত বাতাসে অনুকূল ঢেউ, যেন খেলাচ্ছলে পার হতে হতে জাহাজগুলি চলেছে। বাতাসের কোমল স্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠছে নাবিকদের মন। আহ, সামনের সব দিনগুলি যেন এমনিই যায়!

তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। কলম্বাস বুঝলেন, পোর্তুগালের বাহিনী তাঁর নাগাল আর কখনো পাবে না। নাবিকের দলও সেই আশঙ্কা তখন ঝেড়ে ফেলেছে তাদের মন থেকে। অতএব চলো, সোজা পশ্চিম। পিছনের তটরেখা আর নয়, চাই সামনে অনাবিষ্কৃত উপকূল। এগিয়ে চলো পশ্চিমে, আরো পশ্চিমে।

যে পথে কলম্বাস চলেছেন, মানুষের ইতিহাস সেই পথ ধরে কখনো যায় নি। আটলান্টিকের জলরাশি স্পর্শ পায়নি সভ্যতার অগ্রগতির। সুবিশাল সমুদ্রের মাঝখানে তিনটি জাহাজ যেন তিনটি শ্বেত বিন্দু। মহাসমুদ্র আটলান্টিক তাই মনে মনে নীরবে হাসছিল। তাকে অতিক্রম করবার সাহস এদের হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য, এরা যে কিছুতেই থামে না, এদিক ওদিক বাঁকে না। স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সামনে। যেন সামান্য এক নীল হ্রদের উপর দিয়ে অবলীলায় যাত্রা। সমুদ্রের জলরাশি এবার বিপুল রোষে গর্জন করতে থাকে। তার ঢেউগুলো বাতাসের দাপটে আরও উত্তাল হয়। শান্তামারিয়া কাঁপে, পিনটা নিনা টলমল করে। পিনটার খোলে জল ঢোকে যেন নীল সমুদ্রের বিষ। চারপাশে ভয়াল ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের বিস্তার ক্রমেই বাড়ছে। যেন প্রলয় নাচন নাচতে শুরু করেছেন উন্মত্ত মহাকাল। নিরাশায় ভয়ে কাঁপতে থাকে নাবিকদের মন—এ কোথায় আমরা চলেছি! কলম্বাস কোন্ পথে আমাদের টানছেন? সে কি স্বর্ণপ্রসবিনী ভারত, নাকি অনিবার্য ভয়ঙ্কর মৃত্যুলোক!

(ক্রমশ)

শব্দকূট

প্রসূন ব্যানার্জী

পাশাপাশি :

1. অতীতের সাক্ষী যাকে বলা হয়। 3. রঙ। 4. যার মধ্যে দয়া আছে। 6. দুই প্রকার এককের মধ্যে একটি। 9. বায়ুমণ্ডলের যে স্তর সর্বাধিক উত্তপ্ত হয়। 12. সৌদি আরবের রাজধানী। 15. চীনের ধানের গোলা যে প্রদেশকে বলা হয়।

উপর নিচ :

1. জলের অপর নাম। 2. পরমাণুর ব্যাসের এককের নাম। 3. জঙ্গল। 5. আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। 7. অরুণাচল প্রদেশের একটি শহর। 8. জাপানের সবচেয়ে বড় সমভূমি। 10. নিউজিল্যান্ডের আদিম অধিবাসীদের যা বলা হয়। 11. হিন্দুদের একটি তীর্থ-স্থান। 13. পৃথিবীর সর্বাধিক মৎস্য যে দেশ উৎপাদন করে। 14. চশমার আবিষ্কারক।

প্রযত্নে পিনাকী ব্যানার্জী, লালবাগ, মোতিঝিল রোড, মুর্শিদাবাদ।

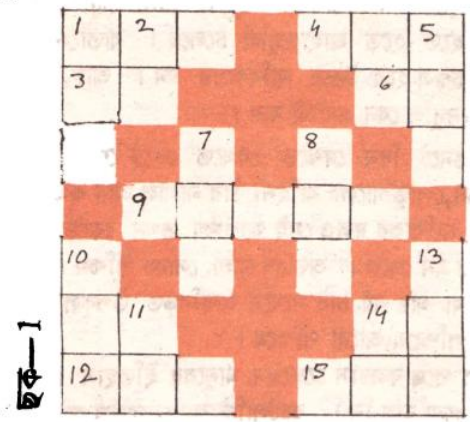

চিত্র—1

আই-কিউ-টেস্ট, অক্টোঃ, নভেঃ '88

1. বাঁ-দিকের সঙ্গে ডান দিকের নামগুলি সঠিক ভাবে মেলাও :

(a) ব্রেলিনার	(a) মাইক্রোফোন
(b) কোলট	(b) ফাউন্টেন পেন
(c) ইলিয়াস হোম	(c) রেল-এঞ্জিন
(d) স্টিফেনসন	(d) সেলাই মেশিন
(e) ওয়াটার ম্যান	(e) রিভলভার

2. হারিয়ে যাওয়া সংখ্যাটি কত ?
   8 24 12 — 18 54

3. ক্যাকটাস জাতীয় গাছের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়—
   (a) সালোক সংশ্লেষের হ্রাসের জন্য, (b) শ্বসন হ্রাসের জন্য, c) প্রস্বেদন হ্রাসের জন্য।

4. ভূ-ত্বকে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস সবচেয়ে কম পরিমাণে আছে ?
   (a) জেনন্, (b) র‍্যাডন, (c) ক্রিপটন।

5. Ampere Second যে রাশিটির একক সেটি হলো—
   (a) ক্ষমতা, (c) তড়িচ্চালক,
   (b) শক্তি, (d) তড়িতাধান বল।

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

আগস্ট, 88 VII-VIII গ্রেড-I

1. লার্সেন অ্যাণ্ড টুব্রো লিমিটেড। 2. উভয় মেরুতে। 3. আরব দেশে ঊনবিংশ শতকে। 4. ফ্লেমিস। 5. ব্রেজিল। 6. সাদা লিলি। 7. তিনটি। 8. ছয়টি পা আছে। 8. দাঁতওয়ালা ছুঁচো জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী নাম স্যাভিস। 10. ভলকান।

আগস্ট, 88 IX-X গ্রেড-II

1. চল্লিশ ঘণ্টা। 2. $3{\cdot}0115 \times 10^{23}$ 3. 28 4. 1 : 4 5. SWORD FISH. 6. দানিয়ুব নদী। 7. আট। 8. এয়োদশ শতাব্দীতে (1231—32) 9. জার্মানীর BUSCHMAN 1821 খ্রীস্টাব্দে। 10. উজবেকিস্তান।

আগস্ট 88 (XI-XII) গ্রেড-III

1. পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি। 2. ধান, যব, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও মুগ। 3. বক-খালি, মুকুটমণিপুর, সজনেখালি ও জলদাপাহাড়ে। 4. OMNIVORES 5. FRUGIVORES. 6. চালতা 7. 9×10^{13} জুল। 8. 10^{13} সে. মি. 9. ঘূর্ণন সৃষ্টি করবে। 10. ক্যাকটাস।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট—আগস্ট '88-এর সমাধান

1. 58 2. b মহাত্মা গান্ধী। 3. 5 কি. মি.। 4. (d বেগুনী। 5. (b) ফ্রান্স।

শব্দকূট সমাধান

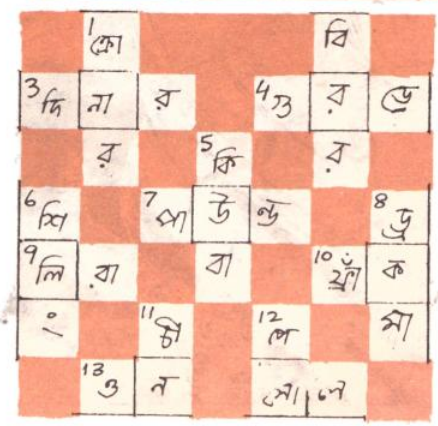

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে বিদ্যুৎ

সিদ্ধার্থশংকর জানা

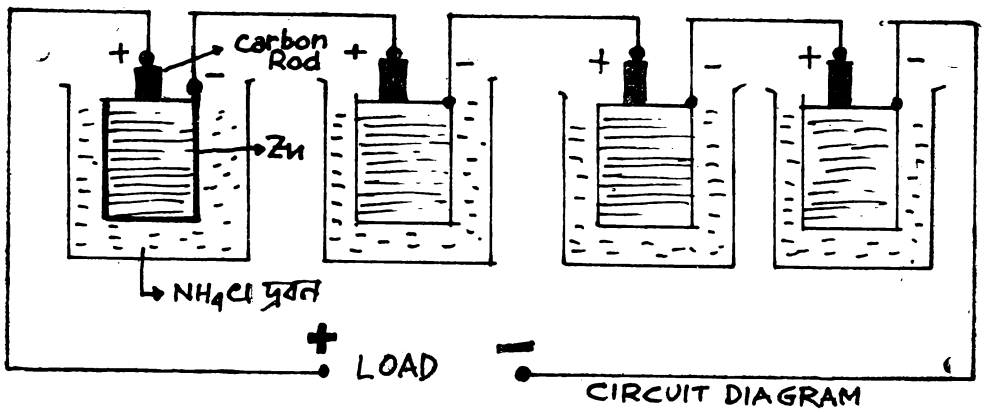

আজ এমন এক পদ্ধতির কথা বলছি, যাহার সাহায্যে অন্য যে কোন পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি কার্যকরী বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়, পুরোন অকেজ ব্যাটারি থেকে। চারটি সেল তৈরি করে আমি প্রায় 5 volt এর মত বিভব-প্রভেদ পেয়েছি। যাহার দ্বারা একটি টেপ রেকর্ডার প্রায় ১১ ঘন্টার মত চলেছে।

পদ্ধতি—

প্রথমে চারটি (এর বেশিও করা যেতে পারে) পুরোন ব্যাটারির কার্বনের খোল ছাড়াতে হবে। উহার (দস্তার খোল নয়) কার্বন রড, পজিটিভ এবং দস্তার খোল নেগেটিভ পোলের কাজ করে। এবার চারটি কাপ বা ঐ জাতীয় পাত্রে ব্যাটারি রেখে উহাতে জল ভর্তি করা হয়। উহাতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) দু-তিন চামচ (চা) দিয়ে জলে দ্রবীভূত করতে হবে। এরপর ব্যাটারিগুলিকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করতে হবে। এতে প্রথম ব্যাটারির কার্বন রড এবং শেষ ব্যাটারির দস্তা হইতে প্রায় 5 volt (এর বেশি) বিভব পাওয়া যাইবে। ঐ বিভবের প্রবাহ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এর ফলে খুব ভালো ভাবেই টেপ রেকর্ডার বাজানো যায়। এটি আমার নিজ পরীক্ষিত।

বেশ কিছুক্ষণ (10-15 ঘন্টা) পর এতে NH_4Cl-এর দ্রবণ দিতে হয়। (গুড়ো দিলেও চলবে) অন্যান্য পদ্ধতিতে পুরানো ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কালে নেগেটিভ তারে Rust পড়ে কিন্তু এ পদ্ধতিতে কোন Rust পড়ে না। এমন কি দ্রবণেও বা ব্যাটারিতে কোন রং উৎপন্ন হয় না। আমার মতে পুরানো ব্যাটারি থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ এই পদ্ধতিতে সর্বোৎকৃষ্ট।

এতে দস্তার ক্ষয় হয়ে যায়, পৃথক দস্তা দিলে আবার কোষটি কার্যক্ষম হয়। প্রকৃত পক্ষে দস্তা বদলানো এবং দ্রবন পালটানো (দ্রবণে গুড়ো NH_4Cl) দেওয়া ছাড়া কোন পরিচর্যা করতে হয় না।

বানেশ্বরপুর, গুজারপুর, শ্যামপুর, হাওড়া।

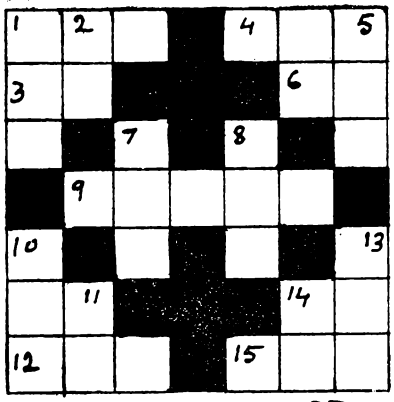

ছক-1

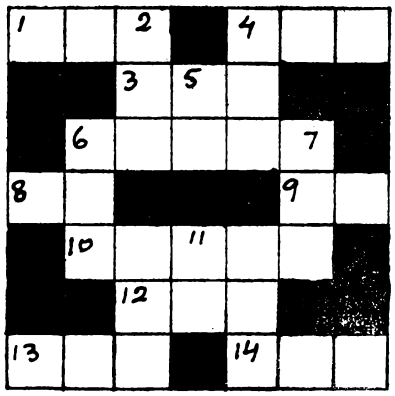

ছক-2

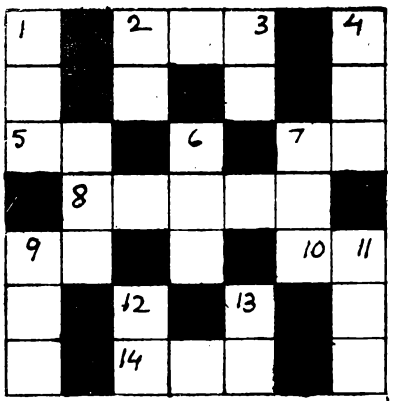

ছক-3

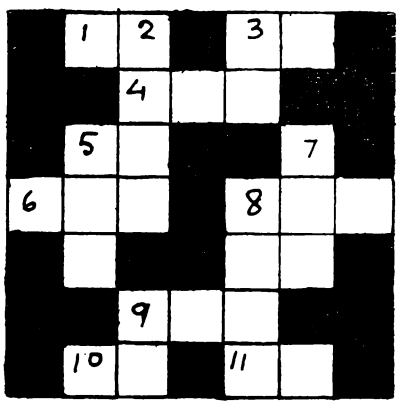

ছক-4

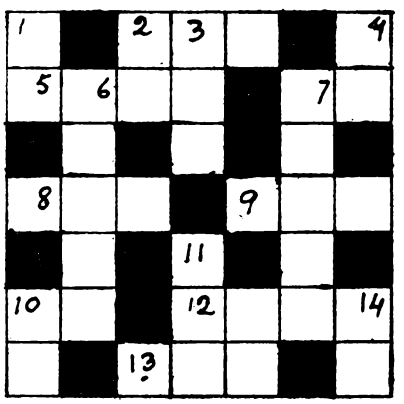

ছক-5

শব্দকূট প্রণেতাদের প্রতি

শব্দকূট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন জুলাই '৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত পাঁচটি ছকের যে কোন একটি পূরণ করে তাদের শব্দকূট তৈরি করে। বেশি ঘরের অনেকে শব্দকূট তৈরি করে পাঠানোয় টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তা' প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না, প্রেরক নিজেও হতাশ হচ্ছে। ছকগুলিতে প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই থাকা, বাঞ্ছনীয়। শব্দকূটের সঙ্গে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা অবশ্যই দিতে ভুলবে না।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

শব্দকূট প্রতিযোগিতায় পুরস্কার

জুলাই '৪৪-এ প্রকাশিত 5টি শব্দ ছকের উত্তরে অনেক শব্দছক আমাদের দপ্তরে এসেছে। কিন্তু কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় ছাপা হবে মাত্র একটি শব্দছক। পরিচালকের মতে প্রতি মাসে প্রাপ্ত ছকগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শব্দছকটি প্রকাশিত হবে। এবং প্রণেতাকে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের তরফে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার অর্পণ করা হবে। তবে প্রতিটি শব্দকূটই হতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক।

পরিচালক : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ।

বিজ্ঞানী আউট : সংশোধনী

শারদীয় কিশোর-জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত 'বিজ্ঞানী আউট' খেলাটিতে সামান্য সংশোধনীর প্রয়োজন। যদিও অনেক পাঠক পাঠিকা নিজেরাই ত্রুটিটুকু সংশোধন করে খেলাটির প্রশংসা করে ইতিমধ্যেই দপ্তরে অনেক চিঠিপত্র পাঠিয়েছেন। F A E ক্রমে কার্ড সাজানোর যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে—তা প্রতিটি বিজ্ঞানীরই বড় হরফে ছাপা নামের আদ্যক্ষর। এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়নি। অর্থাৎ F কার্ডটি বিজ্ঞানী Faraday'র। কিন্তু বাংলায় 'বি' হরফের কার্ডটি পেতে একটু মুশকিল হয়েছে 'বিজ্ঞানী আউট' শব্দটি একসঙ্গে ছাপা হওয়ায়। সমস্ত বিজ্ঞানীর নামগুলি যেখানে ছাপা হয়েছে, সেখানে বসবে, বিজ্ঞানী ও তার পরের ঘরটিতে বসবে—আউট পদ্ধটি। এটি নিতান্তই মুদ্রণ

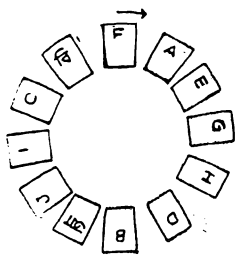

প্রমাদ। এজন্য আমরা দুঃখিত।

—সমীর মণ্ডল

ALBERT EINSTEIN	BENJAMIN FRANKLIN	CHANDRASHEKHAR	DARWIN
EDISON	বিজ্ঞানী ALBERT EINSTEIN BENJAMIN FRANKLIN CHANDRASHEKHAR DARWIN EDISON FARADAY GALILEO HALLEY ISSAC NEWTON JAGADISH BOSE	আউট শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 1988 পরিকল্পনা সমীর মণ্ডল	FARADAY
GALILEO	HALLEY	ISSAC NEWTON	JAGADISH BOSE

কিশোর ক্লাসিকস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০.

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ১২.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০.

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শেক্সপীয়ারের গল্প ১০.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভেপান্তর ২৫.

জগদীশচন্দ্র বসু
অব্যক্ত ১৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
রোমাঞ্চকর ২৫.

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদা বিচিত্রা ২৫.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ২৫.

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বাঙলার ডাকাত (অখণ্ড) ২৫.

ছড়া ও কবিতা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খুকুমণির ছড়া ১০.

অন্নদাশঙ্কর রায়
বিন্নিধানের খই ৮.
হট্টমালার দেশে ৮.

কিশোর রচনাবলী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ৪০.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর রচনা সমগ্র ৪০.

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫.

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০.

মেঘনাদ সাহা
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কিশোর গল্প সমগ্র ৩০.

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার
কল্প বিজ্ঞানের গল্প ১৫.

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মেঘনাদ ১০.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীল মানুষের কাহিনী ১০.

শিশিরকুমার মজুমদার
নাখনাটিয়ার রহস্য ১০.

জনপ্রিয় বিজ্ঞান

সমরজিৎ কর
পরমাণু গবেষণায় ভারত ১০.
মহাকাশ গবেষণায় ভারত ১৫.

বিমান বসু
গ্রহ পরিচয় ১০.
নক্ষত্র পরিচয় ১০.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাংলার গাছপালা ১০.
পশুপাখী কীটপতঙ্গ ১০.
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৮.

সাধন দাশগুপ্ত
আলো আরও আলো ১৫.
রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২.

পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০.

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃথিবীর পরিচয় ১০.

সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ১০.

জয়ন্ত বসু
পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫.

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
বিচিত্র বিজ্ঞান ৮.

জ্ঞানবিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত
স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ ৫০.

অমরনাথ রায় সঙ্কলিত
স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া ২৫.

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ : 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 7ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থাকতে পারেনি অথচ সফল প্রতিযোগী তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার 31 জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর—তাকে under certificate of posting-এ পাঠানো হয়েছে। যদি কেউ না পাও তাহলে স্থানীয় Post master-এর কাছ থেকে একটি Non-reciept certificate-এর কপি সহ পুনরায় আবেদন করতে পারো।

পরচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

আগস্ট'88-এ প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে :

1. **কৃশানু ভট্টাচার্য** 1/8, সোদপুর সয়কারী আবাসন, পোস্ট—সোদপুর উত্তর 24-পরগনা—743178

2. **মহুয়া ঘোষ** প্রযত্নে, পি. এস. ঘোষ 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড কলকাতা-700054

3. **হিমাংশু পাল** প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী-পার্ক) নদীয়া—741222

4. **সৌমেন চ্যাটার্জী** 176/4, শিবপুর রোড হাওড়া—711102

5 **প্রদীপ্ত পাল** প্রযত্নে, যাদব চন্দ্র পাল চুঁয়াপুর পোস্ট—বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।

6. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য** প্রযত্নে, সমীরনাথ ভট্টাচার্য 19/1, আর. এন. টি. রোড পোস্ট+গ্রাম—হরিনাভি দক্ষিণ-24 পরগনা।

7. **সৌভি দত্ত** 11, এস. পি. মুখার্জী রোড বেলঘরিয়া কলকাতা-700056

8. **শ্রীমন্ত চৌধুরী** প্রযত্নে, জ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরী 4, পদ্মনাথ লেন কলকাতা-700004

9. **তন্ময় মহাপাত্র** 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা-700010

10. **দেবরাজ দত্ত** প্রযত্নে, দীপক দত্ত বিবি-48/4 সেক্টর-I সল্টলেক সিটি কলকাতা-700064

আগস্ট '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কৃত হবে :

1. **শিবাজী সাহা** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) P-3 অরসাদিয়া এক্সটেনসান কলিকাতা—700034

2. **তন্ময় মহাপাত্র** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা—700010

3. **হিমাংশু ঘোষ** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) A3-4/2, ভি. কে. নগর দুর্গাপুর, বর্ধমান।

আগস্ট '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ অভিরূপ ঘোষ,

24-পরগনা ঃ কাঞ্চন ভট্টাচার্য,

বর্ধমান ঃ দেবাশিস পানি,

মেদিনীপুর ঃ সৌরভ রায়,

বীরভূম ঃ ফাল্গুনী চক্রবর্তী, মহঃ কামাল মোস্তাফা,

বাঁকুড়া ঃ সুপ্তজিৎ সেনগুপ্ত, রূপাঞ্জন সাহা।

আগস্ট '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, জিতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী পোস্ট—সিউরি, জাঙ্গালপাড়া বীরভূম।

2. **সঞ্জয় কর্মকার** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) বি. পি. রোড চ্যাটার্জী পাড়া পোস্ট কল্যাণনগর দক্ষিণ 24 পরগনা—743503

3. **সুব্রত দে** (সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, করুণাময় দাস গ্রাম—উটপাথর পোস্ট - নিমপুরা, মেদিনীপুর।

আগস্ট '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর সাতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

হুগলী ঃ সুজন সাঁতরা,

মেদিনীপুর ঃ সুনীল দাস,

বীরভূম ঃ প্রণব কুমার ঘোষ,

বাঁকুড়া ঃ দীনদয়াল মণ্ডল, দীপংকর কর্মকার,

মুর্শিদাবাদ ঃ অয়ন গোস্বামী, সোনালী পিলসীমা।

আগস্ট '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যারা পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **কৌশিক পট্টনায়ক** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) গ্রাম—শালিকা পোস্ট—হরিদাসপুর জেলা —মেদিনীপুর—721653

2. **রুনু নিয়োগী** প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী গ্রাম—পানপুর পোস্ট—নারায়ণপুর জেলা—উঃ 24 পরগনা

ক্যুইজ কনটেস্ট
গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

অক্টো-নভেঃ '৪৪ সংখ্যার
ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **অমরনাথ রায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা**

গ্রেড-2 **বিমান বসুর নক্ষত্র পরিচয়**

গ্রেড-3 **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল মানুষের কাহিনী**

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন

১। যদি দু সপ্তাহেরও বেশি আপনার লাগাতার কাশি থাকে অথবা যদি দেখেন স্পুটাম বা থুতুর সঙ্গে রক্ত আসছে তবে হয়তো আপনার ফুসফুসে টি. বি হয়ে থাকতে পারে।

২। কাছাকাছির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্পেন্সারি অথবা টি. বি. সেন্টারে গিয়ে নিজেকে-বিশেষ করে স্পুটাম পরীক্ষা করান।

৩। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নিয়মিত ওষুধ খেলে যক্ষ্মা রোগ সেরে যায়।

৪। রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই ভাল। তাই আপনার সন্তানকে বি.সি.জি. টীকা লাগিয়ে নিন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো (ডি.জি.এইচ.এস)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কোটলা রোড
নিউ দিল্লী-১১০০০২

davp 88/347 BEN

বিজ্ঞান সংবাদ

বিজ্ঞান পুরস্কার

পরিবেশ শিক্ষা দপ্তর, আমেদাবাদ-এর অধিকর্তা কার্তিকেয় ভি. সারাভাই 1988-এর জন্য IUCN প্রদত্ত "Tree of Learning" পুরস্কার পাচ্ছেন। এ বছর IUCN-এর 40তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে ফ্রান্সের ফন্টেনব্লুতে। সেখানেই সারাভাইকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। তিনিই হবেন প্রথম ভারতীয় যিনি এই পুরস্কার পাচ্ছেন।

এই পুরস্কারটির জন্য মোট নাম ছিল আট জনের।

শব্দ দূষণ

কলকাতাবাসীদের প্রতি হাজার জনে আট জন শ্রবণ সমস্যায় ভুগছেন। শব্দদূষণই এর জন্য মূলত দায়ী। সম্প্রতি কলকাতার বোস ইন্‌স্টিটিউট, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এ সম্পর্কে এক সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় জানা গেছে যেক্ষেত্রে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শব্দের আন্তর্জাতিক মান গড়ে 45 ডেসিবলের বেশি হওয়া উচিৎ নয়, সেক্ষেত্রে কলকাতায় ঐ হার গড়ে 75 ডেসিবলেরও বেশি। মৌলালি, শিয়ালদা, গণেশটকি এবং এসপ্ল্যানেড এলাকায় ঐ হার গড়ে 90 ডেসিবল। শ্রবণ সমস্যা ছাড়াও শব্দদূষণ থেকে পেপ্‌টিক আলসার, মাইগ্রেন এবং হৃদরোগ ঘটতে পারে।

বিজ্ঞান আলোচনা চক্র

গত 27.7.88 তারিখে মেদিনীপুর জেলার নন্দী গ্রামের রেয়াপাড়া শ্রীসিদ্ধনাথ বালিকা বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে 'তথ্য-বিপ্লব' (Information Revolution) বিষয় বস্তুর উপর মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি বিজ্ঞান আলোচনা চক্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ব্লকের চারটি বিদ্যালয়ের মোট দশজন ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশ গ্রহণ করে। রেয়াপাড়া শ্রীসিদ্ধনাথ বালিকা বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণীর ছাত্রী উর্মিমালা পড়ুয়া প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকার করে জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়।

গত 14ই আগস্ট 1988 মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ এর উদ্যোগে এবং ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির পরিচালনায় এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে জাতিস্মর, আত্মা, জ্যোতিষ, ভূত, ভগবান প্রভৃতি ও তথাকথিত বহু অলৌকিক ঘটনার বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন শ্রীপ্রবীর ঘোষ।

বিজ্ঞান সেমিনার

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার উদ্যোগে এ বছর ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটরিতে ছাত্রদের জন্য Information Revolution-এর উপর সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারার উপর এই সেমিনারে বহু তথ্য আলোচিত হবে। ব্লক, জেলা এবং রাজ্যস্তরে বহু ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করবে। আগামী 20 ডিসেম্বর 1988-তে দিল্লীতে জাতীয় স্তরে এই সেমিনারে—কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণে সুযোগ পাবে।

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ-এর যৌথ উদ্যোগে Information Revolution-এর উপর কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ব্লক এবং জেলাগুলি থেকে এই আলোচনা চক্রের মাধ্যমে দুজন কৃতী বক্তাকে বাছাই করা হয়। গত 26 আগস্ট 1988 তে বিড়লা সংগ্রহশালায় আয়োজিত শেষ আলোচনাচক্রে রামকৃষ্ণ সারদা-মিশন সিসটার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের কাকলি ব্যানার্জী প্রথম বলে বিবেচিত হয়। কৃতী-প্রতিযোগী হিসেবে কাকলি ব্যানার্জী আগামী 20 ডিসেম্বর 1988তে দিল্লীতে আয়োজিত জাতীয় আলোচনা চক্রে যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

বিজ্ঞান সম্মেলন

গোবরডাংগা রেনেসাঁস ইন্‌স্টিটিউট, পোঃ—খাঁটুয়া, জেলা—উঃ 24-পরগনার দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী 27 থেকে 29 ডিসেম্বর 1988 হুগলী জেলার চন্দন-নগরে। উৎসাহী বিজ্ঞান ক্লাবগুলি এ সম্পর্কে যোগাযোগ করতে পারে উপরোক্ত ঠিকানায়।

মাধ্যমিক
উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য

স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

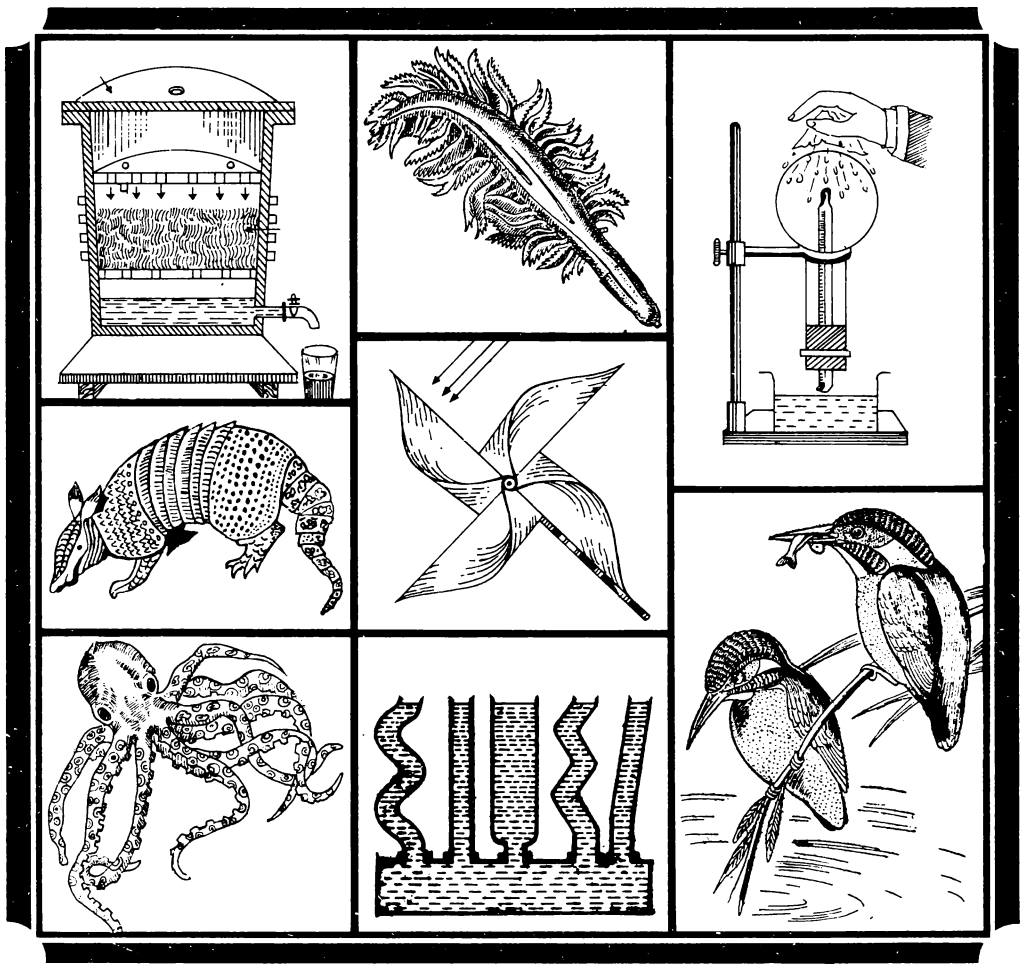

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ।

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL7

পৃথিবী সৌরজগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের অজানা রোমাঞ্চকর অধ্যায়

রাতের আকাশে উজ্জ্বল আলোর চলাফেরা মানুষকে বরাবরই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু দূরবীণের আবিষ্কারের ফলে আমরা সৌরমন্ডলীর গ্রহগুলির অজানা তথ্য সব জানতে পেরেছি। জেনেছি নক্ষত্রের পরিচয়—ধীরে ধীরে চিনতে শিখেছি সপ্তর্ষি ও কালপুরুষকে। যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি—সেই ভূখণ্ডই তো সৌরমন্ডলীর একটি গ্রহ—অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু কি করে সৃষ্টি হল আমাদের এই পৃথিবীর ? চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্ররাজির সৃষ্টি রহস্যের সব কথাই কি আজ আমরা জানতে পেরেছি ?

গত দু দশক ধরে সৃষ্টি রহস্যের যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তারই সমাবেশ ঘটেছে সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী পরিচয় ১০৲

বিমান বসু

গ্রহ পরিচয় ১৫৲

নক্ষত্র পরিচয় ১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

দাম : 4·50 টাকা।